মহাত্মা গান্ধী

জীবনী

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর পোরবন্দরে মাহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। জাতি ও পেশায় তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বৈশ্য। কিন্তু তাঁর পিতা, খুল্লতাত ও পিতামহ চাকুরিজীবী ছিলেন। তাঁর বাবা কিছু সময়ের জন্য রাজকোট ও বাংকান দেশীয় রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। যদিও তাঁর পিতামাতা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন, তথাপি তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিলেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এরূপ সংমিশ্রিত অবস্থার মধ্যেই বড়ো হয়েছেন। কিন্তু তিনি উভয় দিকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে ধর্মীয় ও নৈতিক ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল। তথাপি তিনি কালের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করার ব্যাপারে যথেষ্ট খোলামনের মানুষ ছিলেন।

তাঁর প্রথম দিকের শিক্ষা জীবন ঘটনাবহুল ছিল না। তাঁর এক বন্ধু তাঁকে মাংস-ভক্ষণ, ধূমপান ইত্যাদির জন্য উত্তেজিত করত। তবে এই অভিজ্ঞতাগুলির সুফল হল, এইগুলি গান্ধীজীর মধ্যে চিরকালীন নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করেছিল। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য তিনি ইংল্যান্ডে যান। তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় এবং মায়ের কাছে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা ও মাংসভক্ষণ থেকে বিরত থাকার শপথ নিয়ে দেশান্তর গমনের অনুমতি লাভ করেন। বস্তুত এই শপথই পরবর্তীকালে তাঁর কাছে দৃঢ়সংকল্পের একটি প্রতীকে পরিণত হয় এবং তিনি স্থির বিশ্বাসী হন যে শুভকর্মের উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করলে তা সফল হতে বাধ্য। ইংল্যান্ডে আইন বিষয়ে অধ্যয়ন ছাড়াও তিনি পাশ্চাত্যের যা কিছু শুভ ও মহান সে সম্বন্ধে নিজেকে অবহিত করেছিলেন। তিনি ব্যারিস্টার হয়ে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। অত্যল্পকাল ভারতে থাকার পর এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর কাজে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন। সেখানে থাকাকালীন শ্বেতাঙ্গদের জাতি বৈষম্যের নানা ঘটনার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় এবং সেগুলি তাঁর জীবনাচরণের ধারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। সেখানেই তিনি প্রথমবার ভালোবাসার দ্বারা অশুভকে জয় করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি অনৈতিক নিয়মসমূহের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং তাঁর নৈতিক ও ধর্মীয় ধারণাগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটাতে শুরু করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার দ্বারা অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ হয়ে গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সত্যাগ্রহের কৌশল প্রয়োগ করে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। সামাজিক বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধিগুলি দূর করে ভারতের সমাজ সংস্কারের জন্যও সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাসী ছিলেন যে অহিংস সত্যাগ্রহের পদ্ধতিটিকে জীবনের কেবল ছোটোখাটো সমস্যা সমাধানেই প্রয়োগ

করা যায় না, 'রাষ্ট্রনৈতিক দাসত্ব'-এর মতো গুরুতর সমস্যার সমাধানেও সফলভাবে প্রয়োগ করা যায়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, যখন তিনি শহীদের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তখন তাঁর জীবন প্রায় গৃহস্থের কাহিনিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এস্থলে সেই গল্পের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

যে প্রভাবগুলি তাঁর ভাবনাকে রূপায়িত করেছিল

গান্ধীজীর ভাবনায় মৌলিকতা ও সতেজতা রয়েছে। কিন্তু সেই ভাবনা কিছুসংখ্যক প্রভাবের ছাপ বহন করে। যেমন প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য তাঁর ভাবনার মেরুদণ্ড স্বরূপ। গান্ধীজী সেই পরিবার ও ঐতিহ্যের মধ্যে বড়ো হয়েছেন যেখানে নিষ্ঠাবান হিন্দু ধর্ম ও পূজার্চনায় বিশ্বাস করা হয়। অতি অল্প বয়সেই তিনি গীতা ও রামায়ণ অধ্যয়ন করেন, এমনকি জৈন ও বৈষ্ণব শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যয়ন তাঁর নৈতিক ধারণাকে তীক্ষ্ণ করে এবং ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টিকে প্রজ্বলিত করে।

ইংল্যান্ডে থাকাকালীন তিনি তৎকালীন কিছু বুদ্ধিজীবী ও খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বলা হয় যে যখন তিনি রোমের সেন্ট পিটার্স-এ খ্রিস্টের প্রতিকৃতি দেখেন তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি যিশুর জীবন ও ব্যক্তিত্বে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি যিশু খ্রিস্টের কিছু মৌলিক বাণীকে তাঁর ভাবনায় সন্নিবিষ্ট করেছেন। এজন্য তিনি কোনো কোনো দিক থেকে টলস্টয়ের কাছে ঋণী। টলস্টয় 'The Kingdom of God is within you'-তে খ্রিস্টধর্মের প্রায় নূতন একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। টলস্টয় নানাভাবে গান্ধীজীর মনে ছাপ ফেলেছেন। বিশেষত দুঃখ-কষ্ট ভোগের ক্ষমতার উপর টলস্টয় যেভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা গান্ধীজীর স্বকীয় সত্যাগ্রহের ধারণাটিকে বিকশিত করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। একইভাবে, আমেরিকার মহান চিন্তাবিদ থোরো (Thoreau)ও গান্ধীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর আইন অমান্য আন্দোলনের ধারণা থেকে গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যগুলির সমাধানেও অহিংসার কৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব। এছাড়াও জরথুস্ট্রীয় ও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও গান্ধীজীর প্রাথমিক ধারণা ছিল। আবার রাস্কিনের জীবনাচরণ এবং তৎকালীন কোনো কোনো দিব্যজ্ঞানীর সম্বন্ধেও তিনি সম্যক্ অবহিত ছিলেন। গান্ধীজী তাঁর অন্তরে এবং বাইরেও ধর্মীয়, নৈতিক ও অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলি নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েই গেলেন। তাঁর ভাবনা ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঈশ্বর ও সত্য

গান্ধীজীর সেশ্বরবাদ ঃ একজন দর্শনের শিক্ষার্থীর পক্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গান্ধীজীর দর্শনকে কোনো স্বীকৃত দার্শনিক মডেলে (ছাঁচে) পর্যবসিত করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তিনি দর্শনে

কোনো কেতাবি শিক্ষালাভ করেননি। তাই তাঁর কাছে সর্বেশ্বরবাদ ও সেশ্বরবাদের মধ্যে যে পার্থক্য তা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বলা যায় যে ঈশ্বর সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল বৈষ্ণবীয়। বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল এবং যে পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি বড়ো হয়েছিলেন তাতে সেশ্বরবাদের মূল নীতিগুলি মনে গেঁথে গিয়েছিল।

ভারতে বৈষ্ণবেরা সেশ্বরবাদীদের সমুৎকৃষ্ট। তাঁরা বেদ ও উপনিষদসমূহের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী এবং সেগুলি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে তাঁরা সেই সময়ে ভারতবর্ষে যে অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারা ও বিশ্বাস প্রভাব বিস্তার করেছিল তা গ্রহণ করেননি। মহান অদ্বৈত বেদান্তী শঙ্করাচার্য নির্গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্বে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, যে জগৎকে আপাতভাবে সৎ বলে মনে হয় তা নিছক ব্যষ্টি অবিদ্যা সৃষ্ট ভ্রম। তাই স্বভাবতই অদ্বৈত বেদান্তীরা কখনো ঈশ্বর বা কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। সত্তা যদি অনিবার্যভাবে এক হয়, বহুত্বের প্রত্যক্ষ যদি অবিদ্যা বা ভ্রমের ফল হয়, তাহলে সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ই অসৎ হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, বৈষ্ণব চিন্তাবিদেরা জগৎকে সদ্রূপে গ্রহণ করেন। তাই তাঁরা জগতের স্রষ্টা ও ধারক বা রক্ষকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অদ্বৈত বেদান্তী ও বৈষ্ণবদের মধ্যে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। অদ্বৈত বেদান্তীদের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও অবর্ণনীয়। সুতরাং সত্তার জ্ঞান থেকেই মুক্তি। যেহেতু সত্তা নির্গুণ, তাই সত্তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শিত হতে পারে না। ভক্তিস্থলে সর্বদাই আন্তরব্যক্তি সম্বন্ধ প্রয়োজন হয়। তাই অদ্বৈতীরা মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানমার্গ অনুসরণের পরামর্শ দেন। সেশ্বরবাদী দৃষ্টিতে বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর হলেন ব্যক্তি-ঈশ্বর। বৈষ্ণবেরা মনে করেন যে আবেগহীন, শীতল জ্ঞানমার্গের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং, জ্ঞানমার্গীদের সঙ্গে ঈশ্বরের সর্বদাই একটা দূরত্ব থেকে যায়। বৈষ্ণবদের মতে ঈশ্বরানুভব বা ঈশ্বরের উপলব্ধি প্রয়োজন। তাই, মুক্তির একমাত্র পথ হল অনুভব ও ভক্তির মার্গ। বৈষ্ণবেরা জ্ঞানের গুরুত্ব অস্বীকার না করলেও এটা অনুভব করেন যে মুক্তির জন্য ভক্তি ও আবেগতাড়িত সমর্পণ প্রয়োজন। প্রধানত এইকারণেই বৈষ্ণবীয় ধর্মবিশ্বাস ভারতে এত জনপ্রিয়। এটি এতই সহজ পথের পরামর্শ দেয় যা যে কোনো মানুষের পক্ষেই অনুসরণ করা সম্ভব।

ঈশ্বর সম্বন্ধে গান্ধীজীর দর্শন কঠোরভাবে সেশ্বরবাদী। এটা সত্য যে গান্ধীজী কখনো কখনো প্রায় অদ্বৈতীদের মতো সত্তার নির্গুণ স্বরূপের কথা বলেন। তিনি এরূপ বলেছেন এইকারণে যে তিনি মনে করেন প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসীর নিকট তাঁদের বিশ্বাস ও অনুশীলনের জন্য 'সগুণ' ও 'নির্গুণ'-এর তাত্ত্বিক ভেদ অবান্তর। বস্তুত, তিনি মনে করেন যে নিছক বৌদ্ধিক জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করার জন্য নয়, শক্তি ও সান্ত্বনা লাভের জন্যও ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রয়োজন। ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে শান্তি নিয়ে আসে। তিনি বলেন, ".....যিনি নিছক

বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ করেন, তিনি ঈশ্বর নন। ঈশ্বরকে ঈশ্বর হতে গেলে অবশ্যই আমাদের হৃদয়কে শাসন করতে হবে এবং তাকে রূপান্তরিত করতে হবে।" ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে গণ্য করা হলে এবং আন্তর-ব্যক্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হলে কেবল তখনই ঈশ্বর আমাদের অন্তরের শাসক হতে পারেন। ভক্তি মার্গীদের জীবনাচরণের দ্বারা গান্ধীজী গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই, ব্যক্তি-ঈশ্বরের ধারণায় উপনীত হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল না। কোরান ও বাইবেলের পাঠ গ্রহণের ফলে তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ ধারণা লাভ করেছিলেন।

ঈশ্বর ও সত্যকে অভিন্নরূপে ঘোষণা করায় গান্ধীজীর ঐশ্বরিক ভাবনায় একটি সমস্যা দেখা দেয়। সত্য একটি নৈর্ব্যক্তিক নীতি, আর গান্ধীজীর ভাবনায় ঈশ্বর হলেন ব্যক্তিবিশেষ। তাই, ঈশ্বর ও সত্য কীভাবে অভিন্ন হতে পারে?

সত্যই ঈশ্বর

এই সমস্যার সমাধানে গান্ধীজীর ভাবধারা/চিন্তাধারায় প্রবেশ করা জরুরি। গান্ধীজী এই সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি প্রায়ই নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান স্পষ্ট করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি বলেন, "যৌবনের প্রথমদিকে হিন্দুশাস্ত্র" থেকে ঈশ্বরের সহস্র নাম শিখেছিলাম জপ করার জন্য। কিন্তু এই সহস্র নামই সম্পূর্ণ নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের যত সৃষ্টি (জীব) তত নাম। আমি মনে করি 'সত্য' ঈশ্বরের একটি নাম। আমরা এও বলি যে ঈশ্বর নামহীন। যেহেতু ঈশ্বরের বহুরূপ, তাই আমরা তাঁকে রূপহীন বলেও গণ্য করি। যেহেতু তিনি নানামুখে আমাদের উপদেশ দেন, তাই আমরা তাঁকে বাক্‌হীন বলে গণ্য করি। ....যদি মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়, তবে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আমার কাছে ঈশ্বর হলেন সত্য।"

ঈশ্বর হলেন সত্য—গান্ধীজীর এরূপ বলার সপক্ষে একটি ব্যাখ্যা পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায়। প্রথমত, এটি সার্বিক সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম অন্বেষণের ফল, এটি কোনো বর্ণনা নয়। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরকে সত্যরূপে বর্ণনা করা হয় কেননা কেবল ঈশ্বরই সৎ। গান্ধীজীর মতে সত্য ঈশ্বরের কোনো গুণ নয়, বরং ঈশ্বরই সত্য। তাঁর মতে 'সৎ' শব্দটি থেকে সত্য নিঃসৃত হয় এবং 'সৎ' মানে 'অস্তিত্বশীল'। সুতরাং ঈশ্বর সত্য—একথার অর্থ হল কেবল ঈশ্বরই অস্তিত্বশীল।

কিন্তু পরবর্তীকালে গান্ধীজী 'ঈশ্বর সত্য'-এর পরিবর্তে বললেন 'সত্যই ঈশ্বর'। সাধারণভাবে এরূপ আবর্তন যৌক্তিক সমস্যার সৃষ্টি করে। 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এরূপ বচন থেকে 'সকল মরণশীল জীব হয় মানুষ'—এরূপ বচনে উপনীত হতে পারি না। কিন্তু এরূপ সমস্যার সমাধান হয়ে যায় যখন উদ্দেশ্য ও বিধেয় অভিন্ন হয়। সুতরাং কেউ বলতে পারেন যে 'ঈশ্বর সত্য'—এই বচন থেকে 'সত্যই ঈশ্বর' এরূপ বচনে উপনীত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু গান্ধীজী যে কারণে বচনটির রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন তা এত

সহজ-সরল নয়। তিনি বলেন, "আমার অন্তঃস্থল থেকে বলতে পারি যে ঈশ্বর ঈশ্বর হলেও সর্বোপরি তিনি সত্য। কিন্তু দুবৎসর আগে এককদম এগিয়ে বললাম সত্যই ঈশ্বর। ঈশ্বর সত্য ও সত্যই ঈশ্বর—এই দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে এবং আমি নিরন্তর অদম্য কঠোর সত্যান্বেষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম।"

এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে বচনটির রূপান্তরীকরণের পশ্চাতে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি রয়েছে। একটি যুক্তি হল 'সত্য' শব্দটি 'ঈশ্বর' শব্দের মতো দ্ব্যর্থবোধক নয়। 'ঈশ্বর' শব্দের দ্বারা সকলে একই বিষয়কে বোঝে না, ঈশ্বর সর্বেশ্বর, সেশ্বর, বহুঈশ্বর, এমনকি ধর্মহীন ঈশ্বরও হতে পারে। কিন্তু 'সত্য' শব্দটির তাৎপর্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বচনটি রূপান্তরীকরণের অপর একটি মৌলিক কারণও রয়েছে। গান্ধীজী উপলব্ধি করেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে যৌক্তিকভাবে সংশয় প্রকাশ করা, এমনকি তাঁকে অস্বীকার করাও সম্ভব। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করতে গেলে স্ববিরোধিতা দেখা দেয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বৌদ্ধিকভাবে যুক্তি উত্থাপন করা যায়, কিন্তু বুদ্ধি সত্যকে নস্যাৎ করতে পারে না। জগতে বহু মানুষ আছেন যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করেন এবং অবিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁরাও সত্যকে অস্বীকার করেন না। বস্তুত, সত্যকে সেশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী উভয়েই মেনে নেন। সত্য হল এরূপ একটি বিষয় যা সর্বজন বোধগম্য ও সর্বজন স্বীকৃত। গান্ধীজী বলেন যে একজন নিরীশ্বরবাদীকে 'ঈশ্বর-ভীতু মানুষ' বলে বর্ণনা করলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন, কিন্তু 'সত্য-ভীতু মানুষ' বলে বর্ণনা করলে সানন্দে সমর্থন জানাবেন। গান্ধীজী একারণেই সত্যকে মৌলিকরূপে গণ্য করেছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্ধ ধর্মীয় ধারণাগুলি মানবজাতির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। তাই তিনি 'ঈশ্বর সত্য' বচনটিকে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি ঈশ্বরকে পাত্তা দিই না, যদি তিনি সত্য ছাড়া অন্যকিছু হন।'

সত্য কী? যৌক্তিক অর্থে 'সত্য' বলতে অবধারণের ধর্মকে বোঝায়, কিন্তু আধিবিদ্যক দৃষ্টিতে 'সত্য' হল যথার্থ জ্ঞান, অর্থাৎ যে জ্ঞান সত্তার অনুরূপ। ভারতীয় অধিবিদ্যায় কখনো কখনো সত্যকে স্বপ্রকাশরূপে গণ্য করা হয়। গান্ধীজী 'সত্য' শব্দের এই সকল অর্থকে সমন্বিত করে সত্যকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করেছেন। বস্তুত, তিনি শব্দটির জনপ্রিয় অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। সাধারণ মানুষ 'সৎ' এবং 'সত্য'-এর মধ্যে পার্থক্য করেন না। গান্ধীজী স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন যে 'সত্য' নিঃসৃত হয়েছে 'সৎ' থেকে এবং এর ফলেই তিনি সত্যকে সত্তার সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করেন।

কিন্তু একজন দর্শনের শিক্ষার্থীর সংশয় হতে পারে, কীভাবে সত্য ও সত্তা অভিন্ন হতে পারে? সত্য হল মানব মনের দ্বারা গৃহীত সত্তার চিত্র। সত্তার চিত্র কীভাবে সত্তার সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে? কিন্তু গান্ধীজী তাঁর স্বকীয় পন্থায় সমস্যাটির সমাধান করেছেন। 'বিষয়ের জ্ঞান' ও 'জ্ঞানের বিষয়'—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দ্বৈতবাদী জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়। ধর্মীয় দার্শনিক ও স্বজ্ঞাবাদীরা এই তত্ত্ব খারিজ করেন এবং বলেন যে জ্ঞানই সত্তা (knowing is being)। যে প্রভাবগুলো গান্ধীজীর ভাবনাকে রূপরেখা দান করেছিল, যেমন—উপনিষদ,

খ্রিস্টধর্ম, টলস্টয়ের চিন্তাধারা প্রভৃতি, সেগুলির মধ্যেও জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ সদৃশ ধারণা নিহিত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, গান্ধীজী সত্যকে সত্তার সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করতে গিয়ে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হননি। তাই গান্ধীজী বলেন, "আমার সদৃশ অভিজ্ঞতা আমাকে দৃঢ়বিশ্বাসী করেছে যে সত্য ভিন্ন ঈশ্বর নেই। আমি যে ক্ষুদ্র, ক্ষণিক আভাস পেয়েছি তা হল সত্য কদাচিৎ তার অবর্ণনীয় দ্যুতির ধারণা দিতে পারে। আমরা প্রতিদিন যে সূর্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ লাভ করি এটি তার চেয়ে লক্ষগুণ তীব্র। বস্তুত, ঐ শক্তিশালী আলোর একটি ক্ষীণ আভাস আমি ধরতে পেরেছি মাত্র।"

সত্যই ঈশ্বর—গান্ধীজীর এই উক্তি থেকে কতকগুলি বিষয় নিঃসৃত হয়, যেগুলির ধর্মীয় ও প্রায়োগিক মূল্য আছে। যেমন—ঈশ্বর নয়, সত্যই আরাধনার অভীষ্ট বিষয়। এটি প্রকৃত বিশ্বজনীন ধর্মের একটি ভিত্তি হতে পারে, কেননা 'সত্যের আরাধনা' সকল জাতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রের মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে পারে।

সত্যানুসন্ধানের প্রথম দিকে গান্ধীজী ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নানা চিন্তাবিদের সান্নিধ্যে আসেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের চিরায়ত ধারণা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় সমালোচনার যোগ্য। সত্যকে জানার সচেতন আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাঁরা ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন। গান্ধীজীর এই উপলব্ধি হল যে যুক্তি যে কোনো বিষয়কে অস্বীকার করলেও সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। তিনি দেখলেন যে সকল ধর্মের ধর্মবিশ্বাসীদের, এমনকি নিরীশ্বরবাদীদেরকেও সত্যের পতাকাতলে আনা যাবে। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে কেবল সত্যই হল এমন শক্তি যা দ্বান্দ্বিকতাময় ধারণা ও আদর্শগুলোকে এক করতে পারে। তাই তিনি বলেন, "যদি মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের পরিপূর্ণ বর্ণনা দান সম্ভব হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই বলব যে ঈশ্বর হলেন সত্য। কিন্তু আমি আরও এক কদম এগিয়ে বললাম, সত্যই ঈশ্বর। সত্য বিষয়ে কোন দ্বৈত অর্থ আমি কখনো দেখলাম না। এক্ষেত্রে 'সত্যই ঈশ্বর'—এই লক্ষণ আমাকে মহত্তম তুষ্টি দান করে।"

এর থেকে গান্ধীজীর এই ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয় যে সত্যের প্রতি সচেতন প্রেম ও সত্যের আরাধনা হিন্দু, মুসলিম, এমনকি মার্কসবাদী ও নিরীশ্বরবাদীদেরকেও এক ছাতার তলায় নিয়ে আসবে। একারণেই গান্ধীজী বলেন যে প্রকৃত অর্থে কোনো নিরীশ্বরবাদী নেই।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ

গান্ধীজীর সমালোচকেরা প্রায়ই বলেন যে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেননি। এরূপ অভিযোগের ভিত্তি হল তিনি প্রায়শই অন্তরের বাণী (inner voice) বা বিবেকের বাণীর কথা বলেন। তিনি নিজ অন্তরের বাণীর উপর ভিত্তি করে বিশ্বাসের সত্যাসত্য যাচাই করতেন। বস্তুত তিনি কখনো কখনো যুক্তিকে কল্পনার জাল রচনাকারী বলে বিদ্রূপ করেছেন। 'ইয়ং ইন্ডিয়া'তে তিনি বলেন, "বুদ্ধিবাদীরা শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি, কিন্তু বুদ্ধিবাদকে সর্বশক্তিমান বলে দাবি করলে তা বীভৎস দানবে পরিণত হতে পারে। পুতুল, খুঁটি বা প্রস্তরকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা যেমন মন্দ,

তেমনি যুক্তিকে সর্বশক্তি গুণান্বিত করাও মন্দ। যুক্তিকে অবদমিত করার জন্য আমি সওয়াল করছি না, বরং যা যুক্তিকে পবিত্র করে তার স্বীকৃতির জন্য সওয়াল করছি।"

এর থেকে কেবল একথাই প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বৌদ্ধিক প্রমাণের উপর গান্ধীজী চরম গুরুত্ব আরোপ করেননি। তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন যে কেবল অন্তরোপলব্ধিতেই ঈশ্বরকে জানা যেতে পারে। এমনকি এই আন্তর অভিজ্ঞতাকেই গান্ধীজী ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্যপ্রমাণ বলে মনে করেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে কারণিক যুক্তি প্রায় দেকার্তের বিশ্বতাত্ত্বিক প্রমাণের সদৃশ। গান্ধীজী নিম্নোক্তভাবে যুক্তি প্রদান করেছেন ঃ আমরা অস্তিত্বশীল, আমাদের পিতামাতা অস্তিত্বশীল ছিলেন এবং পিতামাতার পিতামাতাও অস্তিত্বশীল ছিলেন। এইভাবে আরও আরও অতীতে ফিরে গেলে বৈধভাবে প্রশ্ন করা যায়, 'সমগ্র সৃষ্টির জনক কে?' সমগ্র বিশ্বের 'পিতা' কে? গান্ধীজী অনুভব করেন যে এই পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসম্মতভাবে ঈশ্বরের ধারণায় উপনীত হতে পারেন। ঈশ্বরকে সমগ্র বিশ্বের পিতারূপে বোঝা যেতে পারে। এইভাবে ঈশ্বরের ধারণায় উপনীত হওয়া 'কারণিক প্রমাণে'র সদৃশ। কেননা কারণিক প্রমাণে প্রথমে বিশ্বের কথা বলা হয়, তারপর তার কারণ অন্বেষণ করা হয় এবং শেষে ঈশ্বরের ধারণায় উপনীত হতে হয়।

গান্ধীজীর বিভিন্ন স্থানে উল্লেখানুসারে কেউ কেউ তাঁর ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণকে উদ্দেশ্যমূলক প্রমাণ বলেন। বিভিন্ন স্থানে গান্ধীজী বিশ্বের ক্রম ও শৃঙ্খলার কথা বলেছেন। তিনি এও বলেন যে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের একটি নীতি রয়েছে। তারপর তিনি বলেন যে একজন বুদ্ধিমান নীতি প্রণয়নকারীর অস্তিত্বের পূর্ব স্বীকৃতি ছাড়া এই ক্রম, শৃঙ্খলা ও নীতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণের মধ্যে ঐক্য না থাকলে বিশ্বের মধ্যেও ঐক্য থাকত না। তিনি বলেন, 'সকল প্রাণ স্বরূপত অভিন্ন বা এক—আমি এই দর্শনে বিশ্বাস করি। এর জন্য একজন প্রাণবন্ত ঈশ্বর, যিনি আমাদের পরম ভাগ্য নিয়ন্তা, তাঁর প্রতি প্রাণবন্ত বিশ্বাস প্রয়োজন।'

কিন্তু নৈতিক প্রমাণেই গান্ধীজীর সব থেকে বেশি বিশ্বাস ছিল। বস্তুত, গান্ধীজী এই প্রমাণকেই বেশি মূল্যবান বলে মনে করেছেন এবং প্রায়শই এই প্রমাণের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বিবেকের বাণীই ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ বহন করে। তাঁর মতে, বিবেক হল মানুষের দৈবসত্তা। এই সত্তা কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন। এটি কল্যাণকে অনুমোদন করে, আর অকল্যাণের নিন্দা করে। এটি শুভ কর্মের জন্য মহিমান্বিত অনুভব উৎপন্ন করে, আবার অশুভ কর্মের জন্য বেদনা দেয়। অন্তরের বাণীর বিশেষত্ব এই যে এটি অত্যন্ত প্রামাণিক। এর বাণী বাধ্যতামূলক। এই বাণীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনই একজনের কর্তব্য—এটা অনুভব করা কষ্টকর। বিবেকের ডাক-কে গান্ধীজী পরম কল্যাণময় দেহধারী সত্তার ডাকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি স্পষ্টতই বলেন, "ঐশ্বরিক ইচ্ছার কোন বিশেষ প্রত্যাদেশ আমার নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ঈশ্বর নিজেকে প্রতিনিয়তই প্রতিটি মানুষের কাছে প্রকাশ করে চলেছেন, কিন্তু আমরা সেই বাণীর প্রতি অন্ধ হয়ে রয়েছি।"

কখনো কখনো গান্ধীজী 'প্রায়োগিক প্রমাণে'রও উল্লেখ করেছেন। গান্ধীজী মনে করেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস অপরিহার্য, কেননা ঈশ্বর আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিককে চরিতার্থ করে। আমাদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখি যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব ও চাহিদাগুলির অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র প্রকারের অত্যুগ্র বাসনা আছে। এই বাসনা জীবনের সাধারণ বস্তুগত চাহিদা পরিপূরণের মাধ্যমে চরিতার্থ করা যায় না। এই বাসনা হল আধ্যাত্মিক তুষ্টি বিধানের বাসনা। যখন আমরা জীবনের পার্থিব ও বস্তুগত পথগুলি থেকে পরিত্যক্ত হয়ে উদ্বেগ ও সংকটময় মুহূর্তে উপনীত হই, তখন আমরা অত্যন্ত তীব্রভাবে এরূপ বাসনা সম্বন্ধে সচেতন হই। তখন আমরা স্পষ্টতই উপলব্ধি করি যে আমাদের ভালোবাসার পরম বস্তু প্রয়োজন, যার প্রতি আস্থা থাকার ফলে আমরা শক্তি, সান্ত্বনা, শান্তি, এমনকি সুখও আহরণ করতে পারি।

ভালোবাসার এই পরম বস্তুটি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই গান্ধীজী বলেন, "কোন ব্যক্তি প্রাণবন্ত আস্থা দিয়ে তাঁর নিজের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি যাচাই করতে পারেন। যেহেতু আস্থা বাহ্য সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় না, সেহেতু জগতের নৈতিক শাসকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, নৈতিক বিধির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করা এবং সত্যটি ভালোবাসার নীতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করা সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।।"

কিন্তু গান্ধীজীর মতে, কোনো প্রমাণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থা সৃষ্টি করতে পারে না। গান্ধীজীর মতে প্রকৃত অভিজ্ঞতার দ্বারা ঈশ্বরকে অনুভব করা যেতে পারে। এরূপ অভিজ্ঞতার স্বরূপ বা অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কোনো রূপরেখা অঙ্কন করেননি। তিনি কখনো কখনো অবশ্য নৈতিক অর্থ ও নৈতিক অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন, যদিও তা এরূপ অভিজ্ঞতার স্বরূপ নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে নয়। নৈতিক অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস যাচাই করার পথ হিসাবে। এভাবে, গান্ধীজীর মতে ঈশ্বর কেবল ইন্দ্রিয়াতীতই নয়, বৌদ্ধিক প্রমাণকেও অস্বীকার করে। ঈশ্বর হলেন অন্তরোপলব্ধি ও বিশ্বাসের বিষয়।

ঈশ্বরের অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

গান্ধীজী ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার সুযোগ কখনোই হাতছাড়া করেননি। তিনি যে বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি সাধারণত সেশ্বরবাদী; কিন্তু সেগুলি 'সত্যই ঈশ্বর' এই মৌলিক দৃঢ় বিশ্বাসেরই সাক্ষ্য বহন করে।

গান্ধীজীর মতে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। ঈশ্বর হলেন এমন সত্তা যার মধ্যে প্রতিটি বস্তুই প্রাণবন্ত ও সচল। ঈশ্বরকে এইভাবে বুঝে গান্ধীজী সেশ্বরবাদী ঈশ্বরের সঙ্গে আধিবিদ্যক সত্তাকে প্রায় অভিন্নরূপে গণ্য করেছেন। তিনি ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতা বৈশিষ্ট্যটিকে সর্বত্র বিরাজমান—এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, "লক্ষণাতীত (indefinable) কুহেলিকাময় এক শক্তি রয়েছে যা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে । আমি এটা অনুভব করি, যদিও দেখিনি। এ হল এক অদৃষ্ট শক্তি যাকে অনুভব করা যায় কিন্তু

প্রমাণ করা যায় না, কেননা এটি আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য সকলকিছু থেকে অত্যন্ত বিসদৃশ।"

কখনো কখনো ঈশ্বর বিধিরূপে বর্ণিত হন। যদিও এই বর্ণনা থেকে এরূপ ধারণা হয় যে ঈশ্বর হলেন নৈর্ব্যক্তিক নীতি, তথাপি তিনি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের বিধিকে পরস্পর অভিন্ন বলায় এই ধারণার ঊর্ধ্বে উঠেছেন। ঈশ্বর নিজেই বিধি। ঈশ্বর সকল কিছুর শাসক—একথার অর্থই হল সকল কিছুই তাঁর নিয়মানুগত।

গান্ধীজী প্রায়শই ঈশ্বরকে 'ভালোবাসা' বলে অভিহিত করেন। ঈশ্বরকে এরূপে বর্ণনা করার বিষয়টি পরিষ্কার হবে কেবল যখন আমরা ভালোবাসা ও অহিংসা সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণাটি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারব। কিন্তু একটা বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার যে ভালোবাসার পথ ছাড়া ঈশ্বরোপলব্ধির অন্য কোনো পথ নেই। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান। সুতরাং, ভালোবাসাকে ক্রমাগত প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যেকেই ভালোবাসতে পারি এবং তার দ্বারা ঈশ্বর নিজেকেও। এরূপ ভালোবাসার জন্য একপ্রকার আত্মত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ হল অপরের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের কল্যাণের জন্য আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর পন্থাগুলি বিসর্জন দেওয়া।

জগতের স্বরূপ

জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কন দুঃসাধ্য; কেননা জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলি অত্যন্ত অসতর্কতাপূর্ণ ও এলোমেলো। তথাপি, জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর ভাবনাগুলিকে সুসংগঠিত করে পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। গান্ধীজীর মতে প্রকৃতি হল ঈশ্বরের প্রকাশ, সর্বব্যাপী সত্তার সাক্ষ্যবাহী। তিনি বলেন, 'এই বিশ্বে ঈশ্বর নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেন এবং এরূপ প্রতিটি প্রকাশ আমার কাছে শ্রদ্ধাপূর্ণ।'

প্রকৃতির এরূপ বর্ণনা থেকে দুটি বিষয় নিঃসৃত হয়—একটি আধিবিদ্যক ও অন্যটি ব্যবহারিক। যদিও গান্ধীজী সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা বা তার উত্তর দেওয়া কোনোটিই পছন্দ করতেন না, তথাপি আধিবিদ্যক দৃষ্টিতে জগৎ হল ঈশ্বরের একটি প্রকাশ বা অভিব্যক্তি এবং স্বরূপত সৎ ও সসীম উভয়ই। জগৎ সৎ, কেননা তা ঈশ্বরের সৃষ্টি। জগৎ সসীম, কেননা তা স্বয়ং ঈশ্বর নয়। এমনকি বিশ্বের বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব যে এই বিশ্ব সসীম হলেও সৎ। গান্ধীজী বিভিন্ন বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলকে একত্রিত করে দেখেন যে বিশ্বের প্রতিটি অংশের প্রতিটি সঞ্চরণের ও প্রতিটি বিকাশের নিয়ন্ত্রকরূপে একটি বিধি আছে। "সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসহ এই বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই কোনো না কোনো বিধিকে অনুসরণ করে। এই বিধিগুলির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া জগতের অস্তিত্ব ও বিকাশ এক মুহূর্তের জন্যও সম্ভব নয়।" ডি. এম. দত্তের কথায়, "গান্ধীজী প্রত্যক্ষ করেন যে প্রকৃতির এই অপ্রতিরোধ্য বিধিগুলির মধ্যে শক্তি বা ইচ্ছা ছাড়া আর

কিছুই নেই, যা জগতের সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং জগৎকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। তাঁর মতে এই শক্তি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বিধিগুলি ঐ শক্তির কর্মপন্থা (ways of working) ছাড়া আর কিছুই নয়।" এই শক্তিই জগৎকে তার সত্তা প্রদান করে। বিজ্ঞানের দ্বারা প্রায় সুনিশ্চিতরূপে গৃহীত যে, জীবনের অস্তিত্ব ও নানা রূপ (from)-এর মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা আছে। এরূপ বিবেচনা থেকেই জগতের সত্তা প্রতিপাদিত হয়। বিজ্ঞান এটি দেখিয়েছে যে জগৎ ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে— বিকাশের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। প্রকৃতির বিকাশের পথে এই ক্রমাগত যাত্রার অন্তিম লক্ষ্যটি কী? এই অন্তিম লক্ষ্যটি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নয়, যিনি পূর্ণ এবং সবকিছুর পরমাদর্শ। এইভাবে, ঈশ্বর হলেন জগতের আদ্যন্ত। তিনিই জগতের সত্তা।

জগতের সত্তা সম্বন্ধীয় এরূপ আলোচনার একটি ব্যবহারিক দিকও রয়েছে। জগতের সত্তা থাকলে কোনোকিছুর সত্তা অস্বীকার করাটা আত্মঘাতী হবে। গান্ধীজী 'বাঁচার ইচ্ছার অস্বীকৃতিকে কখনোই সমর্থন করেন না। বিপরীতদিকে, তিনি প্রকৃতিকে প্রতিদান দেওয়ার কথা বলেন। তাঁর মতে, প্রকৃতি আমাদের কাছে নিছক কবির আনন্দঘন স্থান নয়, এ এক কর্মক্ষেত্রও বটে। গান্ধীজী অনুভব করেন যে প্রকৃতি মানুষকে 'কর্মস্থল' বা কর্মক্ষেত্র প্রদান করে, যেখানে মানুষ ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে আত্মাকে শাসন করে। একারণেই গান্ধীজী কখনো কখনো প্রকৃতির সৌন্দর্য, পর্বত ও অরণ্যের নিঃস্তব্ধতা, বরফাবৃত হিমালয়ের মহিমার কথা বলেন; আবার অন্যসময়, তিনি প্রকৃতির উপশম শক্তি লাভ করার জন্য প্রকৃতিকে প্রতিদান দেওয়ার কথা বলেন। নেচারোপ্যাথির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি প্রচুর পরিমাণে জল ও বায়ু গ্রহণের কথা বলেছেন। তিনি খালি পায়ে হাঁটার কথাও বলেছেন। এগুলি তাঁর প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার সাক্ষ্য বহন করে।

জগৎ সসীম। এটি সসীম কেননা এটি অসীম নয়, এবং অসীম নয় কেননা দুটি অসীম সত্তা থাকতে পারে না। এই বিশ্বে বিরাজমান অসামঞ্জস্য ও ধ্বংস-শক্তির উল্লেখ করে জগৎকে সসীম বলা হয়। জগতের বিসদৃশ বা বেসুরো ঘটনাবলী সম্বন্ধে গান্ধীজী অন্ধ ছিলেন না। এরূপ ঘটনাবলী জগতের সত্তাকে অস্বীকার করে না, কেবল সসীমতা ও সীমাবদ্ধতাকে প্রমাণ করে। মানুষ এবং প্রকৃতি কেউই অপূর্ণতা থেকে মুক্ত নয়। তাই, এই সসীমতা ও অপূর্ণতাকে অতিক্রম করার প্রয়াস প্রয়োজন।

মানুষের স্বরূপ

দর্শনের ইতিহাসে বহু চিন্তাবিদ আছেন যাঁরা মানুষের স্বরূপ ও অবস্থা নির্ধারণের প্রশ্নে তাঁদের ভাবনা ও মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। এই ভাবনাগুলির কোনো কোনোটি মনোবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত, আবার কোনো কোনোটি আধিবিদ্যক অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফ্রয়েড ও ফ্রয়েডপন্থীরা অচেতন আবেগ ও অত্যগ্র বাসনা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মানুষের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেন। কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী এই সকল

চিন্তাবিদ্‌দের কাছ থেকে সূত্র (clue) নিয়ে মানুষকে কতকগুলি মৌলিক ও সহজাত কামনা-বাসনা, ইচ্ছা ও আবেগের সমষ্টিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। হবসের মতো চিন্তাবিদেরা মানুষকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে মানুষ স্বরূপত আত্মকেন্দ্রিক হলেও তার সামাজিক দিক রয়েছে। মানুষ মূলত স্বার্থপর, যে নিজের সুখের জন্য অন্যের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে, এবং সামাজিক চুক্তি করে। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক অবস্থার নিরিখে মানুষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, মানুষ মূলত ও ঐকান্তিকভাবে সামাজিক জীব, এমনকি সমাজকে বাদ দিয়ে তার কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে না। তাই সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক উপাদান বা শর্তগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মানুষকে সম্পূর্ণরূপে তার সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেন। কোনো কোনো অধিবিদ মনে করেন যে মানুষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ তার সাধারণ (common) ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলির অনুসন্ধান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অ্যারিস্টটল মানুষকে বৌদ্ধিক জীব হিসাবে বর্ণনা করেন। এর অর্থ প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষের অংশীদার।

আবার কিছু অস্তিবাদী ও মানবতাবাদী আছেন যাঁরা মনে করেন যে মানুষকে তার শ্রেণি ধর্মের দ্বারা বর্ণনা করা মানুষের যথার্থ বর্ণনা হতে পারে না। কেননা মানুষের ক্ষেত্রে যে বিশেষত্ব রয়েছে সেগুলি তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষ তার স্বকীয় পন্থায় অভিনব এবং এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যেগুলি কেবল তার কাছেই বিশেষ। বিশেষত, অস্তিবাদীদের মতে মানুষের কোনো বর্ণনাই পর্যাপ্ত হতে পারে না, যদি না তা মানুষের বিশেষত্বকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়। এইভাবে, চিন্তার ইতিহাসে মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা রয়েছে।

কিন্তু গান্ধীজীর মতে মানুষের এই চিত্রগুলি ভাসাভাসা (superficial) ও আংশিক; কেননা এগুলি মানুষ সম্বন্ধে মৌলিক সত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেনি। গান্ধীজীর মতে মানুষের এই চিত্রগুলি বস্তুত কেবল আপাত প্রতীয়মান মানুষের। গান্ধীজী অনুভব করেন যে মানুষের এই সকল বর্ণনা আসলে মানুষের বাহ্য আচার-আচরণের আংশিক বা ভাসাভাসা বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর অর্থ এই নয় যে মানুষের দৈহিক দিকগুলির কোনো সত্তা নেই বা মানুষের আপাত প্রতীয়মান চিত্র অনিবার্যভাবে মিথ্যা। গান্ধীজী মানুষের এই দিকটির গুরুত্ব ও মূল্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষের অন্য একটি দিক রয়েছে যা অনেক বেশি মৌলিক, যা এমনকি দৈহিক দিকটিকে রসদ বা পুষ্টি জোগায়। মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে এই দিকটি সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক বা মনোবৈশ্লেষণিক বা সমাজতাত্ত্বিক মতবাদগুলি হয় উপেক্ষা করেছে অথবা বিস্মৃত হয়েছে। গান্ধীজীর মতে এই দিকটিই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে পারে।

গান্ধীজী অনুভব করেন যে মানুষ হল জটিল জীব। দৈহিক মানুষ আপাত প্রতীয়মান মানুষ। মানুষের দেহ প্রকৃতির অন্যান্য বস্তু সদৃশ। দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হয়। কিন্তু মানুষের এই দিকটি নিছক দৈহিক দিককে তুলে ধরে। মানুষ

কেবল দৈহিক জীব নয়। তার আরও এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি নিছক দৈহিক নয়। তার চেতনা, বুদ্ধি, বিবেক, ইচ্ছা, আবেগ এবং এরকম অনেক গুণাবলী রয়েছে। তার নান্দনিক বোধ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভব এবং কল্যাণ-অকল্যাণের স্বরূপ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। এগুলি নিছক দৈহিক ক্রিয়াকলাপ নয়, এগুলি প্রকৃত মানুষের প্রকাশ, মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আত্মার প্রকাশ।

বস্তুত মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণা তাঁর আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। আধিবিদ্যক দৃষ্টিতে গান্ধীজী একত্ববাদী। তিনি এক পরম ঐশ্বরিক সত্তায় বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন যে আমরা যা কিছুর মুখোমুখী হই তা-ই এক ঈশ্বরের প্রকাশ। সুতরাং, মানুষও ঐ এক সত্তার প্রকাশ। এইভাবে, মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকই ঈশ্বরের প্রকাশ। গান্ধীজী অনুভব করেন যে মানুষের আধ্যাত্মিক দিক তার প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপ তুলে ধরে কেবল এই কারণে যে এটি দৈবিক/ঐশ্বরিক স্বরূপের সদৃশ।

গান্ধীজী স্বীকার করেন যে প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক দিকের সংমিশ্রণ। তিনি এও বিশ্বাস করেন যে প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের দৈহিক দিকগুলির আধিপত্য ছিল এবং বিবর্তন প্রক্রিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক দিকগুলিও প্রকট হয়ে উঠল। তাঁর মতে বিবর্তন হল দৈহিক দিকের আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়া। এরূপ পরিবর্তনের পশ্চাতে লক্ষ্য থাকে আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ উপলব্ধি বা দেবত্বের উপলব্ধি। মানুষের দৈহিক দিকের নিজস্ব গুরুত্ব ও মূল্য থাকা সত্ত্বেও তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই অনিবার্য স্বরূপ নিহিত আছে।

এইভাবে, এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে দেবত্ব বিরাজমান। এই দেবত্বের বিষয়টি নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। মানুষের বুদ্ধি, বিবেক, স্বাধীন ইচ্ছা প্রভৃতি তার মধ্যে দেবত্বের উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে। গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে এই দেবত্বের উপাদানকে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে বা কাজে লাগালে মানুষ এই ধরাধামেই স্বর্গ আনয়ন করতে পারে।

বস্তুত, মানুষের এই দিকটির সব থেকে বেশি স্বচ্ছ বর্ণনা, যা গান্ধী প্রায়শই দিয়েছেন, তা হল ঃ এই দিকটি হল প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিরাজমান ঐকান্তিক কল্যাণময়তা (goodness)-র দিক। যদিও বাহ্যত মানুষকে স্বার্থপর, এমনকি নৃশংস বলে মনে হয়, তথাপি অন্তরের দিক থেকে সে ঐকান্তিকভাবে কল্যাণময়। তিনি বলেন, "মানুষের স্বরূপকে আমি সন্দেহ করি না। মানুষের স্বরূপ যে কোন অভিনব ও হার্দিক কর্মের প্রত্যুত্তর দেবে এবং দিতে বাধ্য।" "অহিংসা পদ্ধতির প্রয়োগে প্রতিটি মানুষের দক্ষ অনুশীলনের ফলে সংস্কৃত হওয়া সম্ভব—একথা স্বীকার্য।" এরূপ সম্ভব কেননা মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক উপাদান অনিবার্যভাবে বিদ্যমান।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঐকান্তিকভাবে বিরাজমান আধ্যাত্মিকতা ও কল্যাণময় বিশ্বাস করার ফলে গান্ধীজী মানবজাতির ঐকান্তিক ঐক্যকেও বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, 'আমি ঈশ্বরের চরম একত্বে বিশ্বাস করি। তাই মানবতাকেও বিশ্বাস করি। যদিও আমরা বহু

দেহধারী, আমাদের আত্মা কিন্তু এক। বিচ্ছুরণের ফলে সূর্যের রশ্মি বহু হয়, কিন্তু তাদের উৎস একই।' এই ঐক্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক—সকল প্রকার কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে আধ্যাত্মিক বিধি নিরন্তর কাজ করে চলেছে এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করছে। তিনি স্পষ্টতই বলেন, 'আমি অদ্বৈতে বিশ্বাস করি। আমি মানুষের ঐকান্তিক ঐক্যে বিশ্বাস করি।'

কর্ম ও পুনর্জন্ম

গান্ধীজী পুনর্জন্মেও বিশ্বাসী। তাঁর পুনর্জন্মে বিশ্বাস স্পষ্টতই হিন্দু বিশ্বাস ও প্রচলিত প্রথায় পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ফলশ্রুতি। অবশ্য পুনর্জন্মের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস তাঁর স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পার্থক্যসূচক চিহ্ন বহন করে। হিন্দু ধর্মে পুনর্জন্ম হল একটি আধিবিদ্যক মতবাদ, যা হল মৃত্যু ও জন্মের মধ্যবর্তী রহস্যময় জীবনের ব্যাখ্যা। গান্ধীজী পুনর্জন্ম অস্বীকার না করলেও পুনর্জন্মের ধারণার গভীরে প্রবেশ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। বিপরীতদিকে, পুনর্জন্মে বিশ্বাসের প্রায়োগিক ও নৈতিক মূল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পুনর্জন্মবাদের একটি নৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি মনে করেন যে পুনর্জন্মের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে কোনো ব্যক্তি নিজেকে তার জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম হন। পুনর্জন্মে বিশ্বাস মানুষকে ঈর্ষা, ঘৃণা ও বৈরিতার তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যেও প্রেমময়, দয়ালু, নৈতিক ও উপকারী হতে সক্ষম করে। এটা সত্য যে জীবন গোলাপ-সজ্জিত বিছানা নয়। জীবনে বিবাদ, সংগ্রাম, কঠোর পরিশ্রম ও দুঃখ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ এগুলোর মুখোমুখী হয়ে ভেঙে পড়ে। কিন্তু পুনর্জন্মে বিশ্বাসের ফলে তার কাছে নব নব সম্ভাবনা ও নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে এই জগতেই সকলকিছুর পরিসমাপ্তি নয় এবং এই জীবনে অনুষ্ঠিত কর্মসমূহের প্রভাব অনাগত জীবনেও থাকবে। এ জীবনে অনুভূত দুঃখ-কষ্টই পরম বস্তু নয়—এরূপ উপলব্ধি মানুষকে শক্তি ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনের মুখোমুখী হতে সমর্থ করে। সুতরাং পুনর্জন্মের সম্ভাবনায় বিশ্বাস ধার্মিক, নৈতিক ও অভিনব জীবনের একটি শর্ত।

কর্মে বিশ্বাস পুনর্জন্মে বিশ্বাসের সহচর। হিন্দুধর্মে কর্মবাদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কর্মবিধি আধিবিদ্যক ও নৈতিক উভয়ই। আধিবিদ্যক দৃষ্টিতে এই বিধি জন্ম ও দেহের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করে। আমাদের বর্তমান জীবন ও শরীর অতীত কর্মের ফল। মনে করা হয় যে কর্ম থেকে একপ্রকার প্রবণতা উৎপন্ন হয় এবং তদনুসারে আমাদের দেহ ও সামর্থ্য গড়ে ওঠে। কর্মবিধিটিকে নৈতিক বিধিরূপেও গ্রাহ্য করা হয়। এই বিধির অন্য নাম 'যেমন কর্মের তেমন ফল।' প্রাচীন ভারতীয় সত্যদ্রষ্টারা মনে করেন যে মানুষের বন্ধন ও দুঃখ-কষ্ট তার অতীত জীবনে কৃত স্বীয় কুকর্মের ফল। আবার বর্তমান জীবনে অনুষ্ঠিত সৎ কর্মের ফল ভাবী জীবনে ব্যক্তিকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে।

গান্ধীজীও কর্মের এই দুটি দিকের উল্লেখ করেছেন। তিনিও একজন অধিবিদের মতো

মানুষের আধিবিদ্যক মর্যাদাকে কর্মের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, "উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দৈহিক-মানসিক উপাদান ও গঠনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তি অভিনব। কোনো ব্যক্তি আসলে তাঁর কৃত কর্মের ফল। ব্যক্তি হল তাঁর অতীতের চিন্তন, অনুভূতি, কথন ও ক্রিয়াকলাপের অভ্যাসের ফল। আন্তর ও বাহ্য—সকল প্রকার বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজেকে গড়ে তোলে। মনুষ্য ক্রিয়াকলাপ এক-একটি স্বতন্ত্রভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যহীন, কিন্তু তারা সন্নিবেশিত হয়ে এক মারাত্মক শক্তিসম্পন্ন হয় যা মানুষের স্বাস্থ্য, চরিত্র এবং সমগ্র নিয়তিকে সুনির্দিষ্ট রূপ দান করে।" কিন্তু মনে হয়, গান্ধীজীর মতে কর্মবিধির নৈতিক তাৎপর্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কেননা নৈতিকতা সম্বন্ধে তাঁর যে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এবং পুনর্জন্মের প্রতি তাঁর যে বিশ্বাস ছিল সেগুলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কোনো ব্যক্তির ভাবী জীবনের স্বরূপ ও অবস্থা নির্ধারিত হয় তাঁর স্বকীয় কর্মের দ্বারা—একথা স্বীকার করলে বলতে হয় যে মানুষ নিজেই নিজের নিয়তি গড়ার কারিগর। তাই ব্যক্তিকেই বিবেচনা করতে হবে যে তাঁর স্বীয় ক্রিয়াকলাপের দ্বারা তিনি নিজেকে ন্যায়বান অথবা ন্যায়হীন মানুষ করে তুলছেন। গান্ধীজীর মতে একথা স্বীকার করলে মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে। মানুষ জানবে যে 'নিজেই নিজেকে উত্তোলিত করা' তার পক্ষে প্রায় বাধ্যতামূলক, যাতে করে সে তার নিজের মধ্যে অব্যক্ত দেবত্বকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি ও প্রকাশ করতে পারে।

অহিংসা

সত্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর তত্ত্ব থেকে অনিবার্যভাবে আমরা অহিংসার স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারি। গান্ধীজী স্বগতোক্তি করেন, "জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার মতো নূতন কিছুই আমার নেই। সত্য ও অহিংসা পর্বতসম প্রাচীন। এই দুটি বিষয়ের উপরই আমি কেবল যথাসাধ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি এবং তা করতে গিয়ে আমি কখনো কখনো বিপথগামী হয়েছি, আবার ভুল-ত্রুটি থেকে শিক্ষাও নিয়েছি। এইভাবে জীবন ও জীবনের সমস্যাবলী সত্য ও অহিংসা অনুশীলনে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়। বস্তুত, এটি হল সত্যানুসন্ধানের পথে অহিংসার আবিষ্কার।" সত্যের ধারণা থেকে অহিংসায় উত্তরণের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "অহিংসা ও সত্য এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত যে তাদেরকে পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র করা বস্তুত অসম্ভব। তারা একই মুদ্রার বা মসৃণ, ছাপহীন, ধাতব চাকতির দুটি দিকের মতো। কে বলতে পারে, কোন্‌টি শীর্ষ আর কোন্‌টি পুচ্ছ (বা কোন্‌টি মুখ আর কোন্‌টি বিপরীতমুখ/প্রতিমুখ)? সত্য হল লক্ষ্য, আর অহিংসা হল সেই লক্ষ্য লাভের উপায়। উপায়কে যথার্থ উপায় হতে গেলে তা অবশ্যই হবে আমাদের নাগালের মধ্যে। সুতরাং অহিংসা হল আমাদের পরম কর্তব্য। উপায়টি যথাযথভাবে অনুসরণ করলে আমরা লক্ষ্যে উপনীত হবোই, হয়তো আগে বা পরে।"

গান্ধীজী কোন্ অর্থে 'অহিংসা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা প্রথমে নির্ধারণ করা যাক। গান্ধীজী চিরায়ত বা প্রথাগত অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো বিশেষ অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করছেন না। কিন্তু তিনি অহিংসার এমন কতকগুলি দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যা অহিংসার অন্য কোনো সমর্থক করেননি। এই গুরুত্বারোপের ফলে শব্দটির একটি গান্ধীয় অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই অর্থটি ব্যবহারিক অর্থেরই সদৃশ, কিন্তু এর কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে।

গান্ধীজীর মতে 'অহিংসা' শব্দটির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার তাৎপর্য আছে। তাঁর মতে ইতিবাচক অর্থটিই অধিকতর মৌলিক, কেননা এই অর্থের মধ্যেই নেতিবাচক অর্থটি নিহিত রয়েছে এবং এই অর্থের মধ্য দিয়েই অহিংসার সারসত্তা প্রকাশিত হয়।

প্রচলিত অর্থে হত্যা না করাই অহিংসা। তবে অহিংসাকে আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে বলা হয় যে হত্যা না করা অহিংসার নিছক একটি দৃষ্টান্ত। এই অর্থে অহিংসা হল আঘাত বা ক্ষতি না করা। অহিংসা হল সকল প্রকার হিংসার বিপরীত। গান্ধীজী এই অর্থ অনুমোদন করে এর সাথে অতিরিক্ত কিছু যুক্ত করেছেন। তিনি বলেন যে দুঃখের কারণই হিংসা—তা সে ক্রোধবশত জীব হত্যাই হোক বা স্বার্থ চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে জীব হত্যাই হোক বা ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে জীব হত্যাই হোক। এই সকলকিছু থেকে বিরত থাকাই অহিংসা। বস্তুত, গান্ধীজী অহিংসা তত্ত্বে জৈনদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জৈন মতে চিন্তনে, ভাষণে ও কর্মানুষ্ঠানে অহিংসা অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে। এই মতানুসারে এমনকি অন্যের জন্য অশুভ চিন্তাও হিংসা পদবাচ্য। কেবল তাই নয়, জৈনমতে এও দাবি করা হয় যে কোনো ব্যক্তি যে কেবল স্বয়ং হিংসানুষ্ঠান করবেন না তা-ই নয়—তিনি হিংসার কারণ হবেন না বা হিংসানুষ্ঠান অনুমোদনও করবেন না। গান্ধীজীর মতে 'অহিংসা' শব্দটির নেতিবাচক অর্থ অবশ্য এতটা কঠোর নয়; কেননা তিনি জানতেন যে জৈনরা যে কঠোর অর্থে অহিংসার কথা বলেন তা পালন করা সম্ভব নয়। তিনি জানতেন যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিংসা অপরিহার্য, যেমন—খাদ্যগ্রহণ, পানীয় গ্রহণ, ভ্রমণ, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায়। অন্য দেহে আঘাত না হেনে আমাদের দেহধারণ অন্তত কিয়দংশে অসম্ভব। বস্তুত, গান্ধীজী বিশেষ পরিস্থিতিতে হত্যা করার প্রকাশ্য পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "জীব হত্যা একটা কর্তব্য হতে পারে। আমাদের দেহধারণের জন্য যত জীব হত্যা করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি, আমরা তত জীবই হত্যা করি। এইভাবে, আমরা খাদ্যের জন্য জীব, শাকসব্জি ও অন্যান্য বিষয় গ্রহণ করি এবং স্বাস্থ্যের জন্য সংক্রামক ব্যাধিবীজ নাশক বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার করে মশা ইত্যাদি জীবকে হত্যা করি। আমরা চিন্তা করি না যে ঐ কর্মের মধ্য দিয়ে অধর্মজাত পাপানুষ্ঠান করছি। প্রজাতির সুবিধার্থে মাংসাশী জীব এমনকি মানুষও হত্যা করি। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘাতকও অপরিহার্য হতে পারে। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি উন্মত্ত হয়ে তরবারি হাতে ভয়ঙ্করভাবে ছুটাছুটি করছে, সামনে চলে আসা

যে কোন ব্যক্তিকেই সে হত্যা করবে এবং জীবন্ত অবস্থায় কেউই তাকে ধরতে সাহস করছে না। যে ব্যক্তি এই পাগলকে হত্যা করবে সে সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবে এবং উপকারী মানুষ হিসাবে পরিগণিত হবে।" এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় যখন তিনি বলেন, "আমি দেখি যে যে কোন পরিস্থিতিতেই হোক জীব হত্যার ক্ষেত্রে একটা সহজাত আতঙ্ক আছে। যেমন, কোন এক জায়গায় পাগল কুকুরের সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য কুকুরগুলির ধীর মৃত্যু অনুমোদিত হয়েছে। এখন আমার সমবেদনার ধারণা এই বিষয়টিকে আমার পক্ষে অসম্ভব করে তোলে। কুকুর বা অন্য কোন প্রাণী যখন ধীর মৃত্যুর অসহায় নির্যাতন সহ্য করে তখন তা আমি এক মুহূর্তও দেখে সহ্য করতে পারি না। এরূপ পরিস্থিতিতে আমি মানুষ হত্যা করি না, কেননা আমার কাছে আরও বেশি আশাবাদী প্রতিকার আছে। একই পরিস্থিতিতে একটি কুকুরকে আমার হত্যা করা উচিত, কেননা কুকুরটির ক্ষেত্রে আমার কাছে কোন প্রতিকার নেই। মত্ত কুকুর আমার সন্তানকে আক্রমণ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তীব যন্ত্রণা উপশমের কোন সহায়ক প্রতিকার নেই। কুকুরটির প্রাণ নেওয়া আমার কর্তব্য—এটা বিবেচনা করা উচিত। নিয়তিবাদের সীমাবদ্ধতা আছে। যখন আমাদের কাছে প্রতিকারের কোন উপায় থাকে না, তখন আমরা বিষয়টিকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দিই। একটি নির্যাতিত শিশুকে তীব্র যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার চরম উপায় হল তাকে হত্যা করা।" এভাবে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে জীব হত্যা করাকে গান্ধীজী প্রায় একটা সদ্‌গুণ বলে মনে করেন। বস্তুত, তিনি অনুভব করেন যে তাঁর প্রদত্ত দৃষ্টান্তের মতো সদৃশ পরিস্থিতিতে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই যন্ত্রণা। তাই, হত্যা না করার অর্থই হল যন্ত্রণা ও তীব্র কষ্টকে দীর্ঘায়িত করা। এভাবে, অহিংসাকে গান্ধীজী ঈষৎ ভিন্নভাবে বুঝেছেন।

তাঁর মতে হত্যা বা জীবনের ক্ষতি কেবল কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতেই হিংসাত্মক কর্ম হতে পারে। এই পরিস্থিতি বা শর্তগুলি হল ক্রোধ, অহঙ্কার, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, মন্দ অভিপ্রায় এবং এরূপ আরও অন্যান্য বিষয়। এই সকল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে জীবনের যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধনকে হিংসা বলে। এভাবে, অহিংসার নেতিবাচক অর্থ হল 'হত্যা না করা বা ক্ষতি না করা।' কিন্তু এর পূর্বস্বীকৃতিটি হল অহিংসার ক্রিয়া ঘৃণা, ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং এই ধরনের বিষয়গুলি থেকে মুক্ত।

কিন্তু গান্ধীজীর মতে অহিংসার ইতিবাচক দিকগুলি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের তুলনায় অধিকতর মৌলিক। প্রাণীর প্রতি কেবল ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত থাকাই অহিংসা নয়, অন্যান্য প্রাণীর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব/দৃষ্টিভঙ্গিকেও উন্নত করতে হবে।

গান্ধীজীর মতে অহিংসার একটি ইতিবাচক দিক হল যে এটি মানবজাতির মৌলিক ও অপরিহার্য গুণগুলির অন্যতম। এর অর্থ এই নয় যে জীবনে হিংসার কোনো স্থান নেই। বস্তুত, কোনো ব্যক্তিকে তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেও কোনো প্রকার সহিংস আচরণ করতে হয়। তথাপি অহিংসা আমাদের বিধিরূপে পরিগণিত হয়, কেননা হিংসার দ্বারা

কল্যাণ সাধিত হলেও সেই কল্যাণ নেহাতই সাময়িক। হিংসার দ্বারা স্থায়ী কোনোকিছু গড়ে ওঠে না। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে সচেতন ও সৎ উদ্দেশ্য নিয়েও যারা লোভী ও অসৎ ব্যক্তিদেরকে পাশবিক বলপ্রয়োগ করে বিতাড়িত করেছে, তাদেরই আবার মন্দ অভিপ্রায় দেখা দিয়েছে।

অহিংসা মানুষের স্বাভাবিক বিষয়—এই পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত উদ্ধৃতিটি থেকে গান্ধীজীর উপরোক্ত ধারণাটি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নানাভাবে এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব যে যদিও প্রারম্ভিক পর্যায়ে পাশবিক শক্তি প্রধান হয়, তথাপি ক্রমবিকাশের ধারাটি কিন্তু অহিংসা অভিমুখী। বস্তুত, প্রতিটি প্রজাতির ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায় যে কোনো প্রাণীই তার নিজের অপত্যদের খায় না বা বিনাশ করে না। বিশেষত মানুষের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট। মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়। দেহের মধ্য দিয়ে দৈহিক শক্তি প্রকাশিত হয়। সুতরাং মানুষ সহিংস আচরণ করতে পারে। কিন্তু মানুষের প্রকৃত স্বরূপ গড়ে ওঠে তার আধ্যাত্মিক দিকগুলিকে নিয়ে। আধ্যাত্মিক দিক থেকে মানুষ অনিবার্যরূপে অহিংস। একটি সহজ দৃষ্টান্ত হল ঃ দেহ বা ইন্দ্রিয়গুলিকে আহত করেও আত্মাকে আহত করা যায় না। ('ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'; অর্থাৎ শরীরকে হনন করেও আত্মাকে হনন করা যায় না।) সুতরাং, হিংসা মনুষ্য প্রকৃতির বিরোধী। যে মুহূর্তে মানুষের আধ্যাত্মিকতা জাগ্রত হয়, তার অহিংস স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত, ইতিবাচক দিক থেকে অহিংসা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভালোবাসা হল একপ্রকারের একত্বের উপলব্ধি। ভালোবাসার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেকে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে। প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহের প্রতিবন্ধকতাগুলি থেকে মনকে মুক্ত করতে না পারলে এরূপ অভিন্নতাবোধ সম্ভব নয়।

সুতরাং অহিংসার জন্য ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ঈর্ষা, প্রতিশোধ ইত্যাদি থেকে মনকে মুক্ত করা প্রয়োজন ; কেননা এগুলি ভালোবাসার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। গান্ধীজীর মতে ভালোবাসা হল শক্তি যা ব্যক্তির অন্তরকে নির্মল করে এবং জীবনকে উচ্চস্তরে উন্নীত করে। ভালোবাসার দ্বারা পরোপকারিতা, করুণা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, মহানুভবতা, দয়া, সমবেদনা ইত্যাদি মহানুভবগুলি বোধগম্য হয়।

ভালোবাসা হল কঠোর নিয়মানুবর্তিতা। ঘৃণা করা সহজ, কিন্তু ভালোবাসার জন্য প্রয়োজন চরম উৎসাহ ও শক্তি। এই উৎসাহ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও কাউকে যখন শত্রু বলে মনে করা হয় তখন তাকে ভালোবাসা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই গান্ধীজী বলেন যে অহিংসা বলশালীদের জন্য, দুর্বলদের জন্য নয়। অত্যন্ত সহজভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। গান্ধীজী বিশ্বাস করেন যে হিংসা একান্তভাবেই দুর্বলতার প্রকাশ। যে ব্যক্তি অন্তরে দুর্বল তার মধ্যে একপ্রকার ভীতি সঞ্চারিত হয় এবং সেই ভীতি থেকে বাস্তবিক বা কাল্পনিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে শুরু করে। হিংসার মধ্যে শক্তির প্রকাশ থাকতে পারে, কিন্তু তা ভীতিসঞ্জাত এবং তাই তা দুর্বলতার চিহ্ন। কেবল সে-ই প্রকৃত অহিংস

হতে পারে যে ভয়কে জয় করেছে। হত্যা করার সামর্থ্য শক্তির সূচক নয়, মৃত্যুবরণের শক্তিই প্রকৃত শক্তি। ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠে একজন যখন এই শক্তি আছে বলে দাবি করতে পারে তখন সে অহিংসার অনুশীলন করতে সমর্থ। "একটি অসহায় ইঁদুর অহিংস নয় কেননা বিড়াল তাকে যে কোন সময় খেয়ে নিতে পারে। ইঁদুরটি পারলে সানন্দে খুনীকে (বিড়ালকে) ভক্ষণ করত।" বস্তুত, "আঘাত হানার সামর্থ্য অহিংসার পূর্বশর্ত।" অহিংসা অনুশীলনকারীর প্রতিপক্ষকে পরাভূত করার ক্ষমতা থাকে। তথাপি সে অহিংসার অনুশীলন চালিয়ে যায় কেননা "অহিংসা হল প্রতিহিংসার কামনাকে সচেতন ও স্বেচ্ছাকৃতভাবে সংযত করা/দমন করা।" বস্তুত, যে প্রকৃত শক্তিশালী সে নির্ভীক ভালোবাসার দ্বারা জয়লাভ করতে পারে, হিংস্র বা পাশবিক বলপ্রয়োগের দ্বারা নয়।" অহিংসার অর্থ পাপাচারীর হিংসার কাছে আত্মসমর্পণ নয়। এর অর্থ হল অত্যাচারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমগ্র আত্মাকে নিয়োজিত করা। অহিংসা নীতির অনুসরণে কর্ম করলে কেবল একজন ব্যক্তির পক্ষেই অন্যায়মূলক সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে পরাস্ত বা প্রতিরোধ করা সম্ভব।"

অহিংসাকে আবার কর্মনীতি হিসাবেও দেখা হয়। অহিংসা কোনো উদাসীনতা বা নিষ্ক্রিয়তা নয়। অহিংসার বীজ হৃদয়ের গভীরে শায়িত। কিন্তু তা কর্মের মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয় ও অভিব্যক্ত হয়। তাই, অহিংসা হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যার মধ্যে ধারাবাহিক ও অটল সুচিন্তা, প্রয়াস, কঠোর প্রয়াস ও ক্রিয়া রয়েছে। অহিংসার জন্য অনুশীলনকারীর পক্ষে চরম ধৈর্যের প্রয়োজন। কিন্তু এই ধৈর্য নিষ্ক্রিয়তার লক্ষণ নয়, এটি হল একটি সচেতন ও আন্তর প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি। এর দ্বারা তথাকথিত প্রতিপক্ষকে তার স্বকীয় ভ্রান্তিটি প্রদর্শন করানো হয় এবং ভ্রান্তিটি তাকে উপলব্ধি করানোও হয়।

এই কারণেই বলা হয় যে অহিংসার মধ্যে আত্মবলিদান ও যন্ত্রণাভোগ রয়েছে। গান্ধীজীর মতে আত্মবলিদান ভালোবাসার অবিচ্ছেদ্য সহচর। ভালোবাসায় প্রয়োজন একটি অতিবর্তী যাত্রা, একটি আত্ম-অতিক্রান্তি। কেবল নিঃস্বার্থপর ব্যক্তির পক্ষেই ভালোবাসা সম্ভব। এরূপ নিঃস্বার্থপর ব্যক্তি কেবল 'দানে' বিশ্বাসী, গ্রহণে নয়। গান্ধীজী বলেন, "ভালোবাসা সর্বদাই দান করে, কখনোই দাবি করে না। ভালোবাসা সর্বদাই যন্ত্রণাভোগ করে, কখনোই বিরক্ত হয় না, আত্ম-প্রতিশোধ নেয় না।" এটি আত্মবলিদান এবং এর মধ্যে রয়েছে যন্ত্রণাভোগ। "ভালোবাসার পরীক্ষা হল তপস্যা এবং তপস্যা হল আত্ম-যন্ত্রণাভোগ।" গান্ধীজী মনে করেন যে যন্ত্রণাভোগ হল জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সবচেয়ে সুনিশ্চিত পন্থা। যদি আমরা শান্তভাবে যন্ত্রণাভোগ করি, তাহলে বিরোধীকে তার ক্রোধ প্রশমনের জন্য সময় দিতে পারি। সে তখন তার ভুল বুঝতে পারে। অবশ্য, সচেতন যন্ত্রণাভোগের একটি পূর্বশর্ত হল যে সেখানে অবশ্যই ভালোবাসা থাকবে এমনকি বিরোধীদের জন্যও এবং তার মধ্যে কল্যাণের প্রতি তার যে বিশ্বাস আছে তাতেও। এটি ছাড়া যন্ত্রণাভোগ বিফলে যাবে। এই কারণেই যন্ত্রণাভোগকে ভালোবাসার একটি দিক হিসাবে গণ্য করা হয়। গান্ধীজীর মতে ভালোবাসার মূল স্বরূপ উপভোগ নয়, যন্ত্রণাভোগ। বস্তুত, একজন অহিংস ব্যক্তি অবনত

হয় না, বরং সহিংস বা বিরোধী ব্যক্তিকেই অবনত হতে হয়। অহিংস ব্যক্তি সর্বাধিক পর্যায়ে ক্ষমা প্রদর্শন করে, কিন্তু বিরোধী ব্যক্তি তা করে না।

গান্ধীজী দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন যে অহিংসা সার্বিকভাবে অনুশীলিত হতে পারে। অহিংসা হল একটি শক্তি যা সর্বদেশের সর্বকালের বালক-বালিকারা, যুবক-যুবতীরা, পূর্ণ বয়স্কেরা সকলেই সমানভাবে ব্যবহার করতে পারে। অহিংসায় কোনো বাহ্যবস্তুর ব্যবহার প্রয়োজন হয় না, এর জন্য প্রয়োজন সচেতন উদ্দেশ্য ও বিশুদ্ধ অভিপ্রায়। প্রতিটি ব্যক্তিই এটি অনুশীলন করতে পারে—এমনকি সমাজ বা রাষ্ট্রগুলিও।

কিন্তু অহিংসার অনুশীলনের সঙ্গে একটি পরম শর্ত সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বরে প্রাণবন্ত ও অব্যর্থ বিশ্বাস না থাকলে কারও পক্ষে অহিংসার অনুশীলন সম্ভব নয়। অহিংসার অনুশীলনের জন্য একটা শক্তি প্রয়োজন, যা কেবল ঈশ্বরের প্রতি প্রাণবন্ত বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন হতে পারে। ঈশ্বরের প্রতি সচেতন বিশ্বাস থেকে মানুষ বুঝতে পারে যে সকল মানুষই সমগোত্রীয় এবং অপরিহার্যরূপে এক। এইভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা মানবতার প্রতি ভালোবাসায় পরিণত হয়, যা একাই অহিংসার অনুশীলনকে সম্ভব করে তোলে। মানবজাতির ঐক্য উপলব্ধি করলে তবেই কোনো ব্যক্তি তার সমগোত্রীয় বা সতীর্থদেরকে ভালোবাসতে সমর্থ হবে। সুতরাং অহিংসার অনুশীলনে সর্বাধিক মৌলিক শর্ত হল ঈশ্বরে বিশ্বাস।

অহিংসার কৌশল—সত্যাগ্রহ

গান্ধীজী অবহিত ছিলেন যে, অহিংসা অনুশীলনের একটি পন্থা প্রদর্শিত না হলে সত্য ও অহিংসার মূল্যের উপর তাত্ত্বিক গুরুত্বারোপ কোনো কার্যকর ফল প্রদান করে না। এজন্য তিনি অহিংসার একটি কৌশল রূপায়িত করেছেন, যার নাম দিয়েছেন 'সত্যাগ্রহ', যাকে ইংরেজিতে Truth-force (সত্য-শক্তি), এমনকি কখনো কখনো Soul-force (আত্ম-শক্তি) বা Love-force (প্রেমশক্তি) বলে অনুবাদ করা হয়। গান্ধীজী তাঁর জীবনব্যাপী এই কৌশল নিয়ে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন এবং এর সুনির্দিষ্ট রূপদানে সফল হয়েছেন। এই কৌশলের স্বরূপ যথাযথভাবে বর্ণনা করতে গেলে গান্ধীজীর স্বকীয় ভাষাতেই বর্ণনা করা ভালো। সত্যাগ্রহের স্বরূপ বর্ণনা করে গান্ধীজী বলেন, "মাতৃভাষায় এর সমার্থক শব্দটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় Truth-force (সত্য-শক্তি)। আমার মনে হয় টলস্টয় এটাকে আত্ম-শক্তি বা প্রেমশক্তিও বলতেন। এই শক্তি সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হলে শক্তিটি আর্থিক ও অন্যান্য পার্থিব বিষয় নিরপেক্ষ হয়। আসলে, হিংসা হল এই মহান আধ্যাত্মিক শক্তির অস্বীকৃতি (negation)। যারা হিংসা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে তারাই কেবল আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হতে পারে। ব্যক্তির মতো বিভিন্ন সম্প্রদায়ও এই শক্তি ব্যবহার করতে পারে। এটিকে রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োগ করা যায়, তেমনি পারিবারিক বা ঘরোয়া ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। (এর সার্বিক প্রয়োগ যোগ্যতা হল এর স্থায়িত্ব ও অজেয়তা থেকে আগত/নিষ্কাশিত বিষয়।) এটি পুরুষ,

নারী ও শিশুদের দ্বারাও ব্যবহৃত হতে পারে। দুর্বলেরা যতদিন পর্যন্ত না হিংসার দ্বারা হিংসা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে ততদিন পর্যন্ত কেবল দুর্বলেরাই এটি ব্যবহার করবে—একথা সম্পূর্ণ অসত্য। Passive Resistance (নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ)—এই ইংরেজি কথাটির অসম্পূর্ণতা থেকে এই কুসংস্কারের উদ্ভব। এই শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে যারা নিজেদেরকে দুর্বল বলে মনে করে তাদের পক্ষে এটি প্রয়োগ করা অসম্ভব। কেবল যারা একথা উপলব্ধি করে যে মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যা তার মধ্যে নিহিত পাশবিক শক্তির থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং তারা নিজেরাও সেই শ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী, তারাই সক্রিয়ভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী হতে পারে।"

গান্ধীজীর রচনা থেকে গৃহীত এই সুদীর্ঘ অনুচ্ছেদের মধ্যেকার ধারণাগুলি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যাত হলে সত্যাগ্রহের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হবে। 'সত্যাগ্রহ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে গান্ধীজীর মতে, সত্য হল ঈশ্বর এবং সত্যাগ্রহ হল 'সত্য'-এর 'আগ্রহ'। সুতরাং সত্যাগ্রহের জন্য প্রয়োজন সত্যের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সচেতনতা বা আগ্রহ। সত্যের দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও উপায়/পথগুলি প্রকাশিত হয়। তাই সত্যের পথ অনুসরণ করা কঠিন। সত্যের পথকে ঈশ্বরের পথরূপে গণ্য করা ছাড়া উপায় নেই। এই অর্থে সত্যাগ্রহ অত্যন্ত কঠোর।

এর অর্থ হল সত্যাগ্রহ ঐকান্তিকভাবে ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত, গান্ধীজীর কাছে সত্যাগ্রহ হল একটি ধর্মীয় বিষয়। প্রতিটি বস্তু ও জীবের মধ্যেই এক ঈশ্বর আছেন—এই ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর সত্যাগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। আমাদের সকলের মধ্যে একই ঈশ্বর আছেন। এটাই ভালোবাসার ভিত্তি। মানবজাতির প্রতি এই মৌলিক ভালোবাসা না থাকলে সত্যাগ্রহের কৌশল অনুশীলন করা সম্ভব নয়।

সত্যাগ্রহের অন্য একটি ধর্মীয় পূর্বস্বীকৃতি আছে। বস্তুত, কৃচ্ছ্রতাবাদী নৈতিক মতবাদগুলি বিশ্বাস করে যে অন্য প্রকারের জীবন অর্থাৎ পুনর্জন্ম সম্ভব, তা না হলে তাদের বিশ্বাসের কঠোর কৃচ্ছ্রতাবাদী বৈশিষ্ট্য/চরিত্রটিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। গান্ধীজীও বিশ্বাস করেন যে পুনর্জন্মে বিশ্বাস সত্যাগ্রহের একটি পূর্বশর্ত। সত্যাগ্রহের জন্য কোনো প্রকার সুবিধা বা লাভের কথা বিবেচনা না করেই অর্থাৎ নিঃস্বার্থপরভাবে সচেতন অনুসন্ধান প্রয়োজন। কিন্তু কোনো ব্যক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার প্রান্তের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে সমর্থ হবেন কেবল যদি তিনি বিশ্বাস করেন যে এই জীবনে বা পরবর্তী কোনো জীবনে তিনি তাঁর সুকর্মের ফল পাবেন। তিনি বলেন, "দেহোত্তর আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে সে (সত্যাগ্রহী) বর্তমান শরীরেই সত্যের বিজয়মুকুট পরতে অধৈর্য হয় না।"

গান্ধীজী সত্যাগ্রহকে হিংসা, স্বৈরাচার ও অন্যায়ের বিরোধী শক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। সর্বব্যাপী ও সর্বজনগ্রাহ্য 'সত্য'-কে তাচ্ছিল্য করার ফলস্বরূপ এই সকল কুকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং গান্ধীজী বলেন যে যদি আমরা অপরাধের দ্বারা অপরাধ, হিংসার দ্বারা হিংসা, ক্রোধের দ্বারা ক্রোধ প্রতিহত করতে শুরু করি তাহলে তা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো হবে।

এই সকল অপরাধের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর শক্তি প্রয়োগ করতে চাইলে তা কেবল সত্যাগ্রহের দ্বারাই সম্ভব হবে।

সত্যাগ্রহ প্রতিপক্ষকে তার ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে এবং তার দ্বারা ভ্রম সংশোধন করে পথ পরিবর্তন করতে সুযোগ দেয়। সত্যাগ্রহের মূলে এই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঐকান্তিক কল্যাণের উপাদান রয়েছে, কেননা মানুষের নিজের মধ্যেই দেবত্ব রয়েছে। মানুষের এই দিকটিকে জাগ্রত করা প্রয়োজন। যে মুহূর্তে কল্যাণের উপাদান জাগ্রত হয়, ব্যক্তি স্বয়ং সেই মুহূর্তের অনুষ্ঠিত কর্মের ত্রুটি উপলব্ধি করতে পারে। অহিংসা হল সচেতন যন্ত্রণাভোগ। সুতরাং সত্যাগ্রহী যন্ত্রণাভোগ করে এবং তার দ্বারা প্রতিপক্ষকে রূপান্তরিত করে। গান্ধীজী বলেন, "ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রও গঠিত হয় তীব্র যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে, অন্য কোনো উপায়ে নয়। অন্যকে দুঃখের আঘাত দিয়ে আনন্দ আসে না, আনন্দ আসে নিজের ইচ্ছাপ্রসূত দুঃখ থেকে।"

এইকারণে সত্যাগ্রহকে দমনের পদ্ধতিরূপে বর্ণনা না করে রূপান্তরকরণের পদ্ধতি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দমনে হিংসা থাকে, সে হিংসা দৈহিক না হলেও অন্তত মানসিক। অন্যায়কারীকে বিব্রত করা সত্যাগ্রহের লক্ষ্য নয়। সত্যাগ্রহে ভীতির কোনো স্থান নেই,আবার ভয় দেখিয়েও সত্যাগ্রহী হওয়া যায় না। সত্যাগ্রহ অন্যায়কারীর হৃদয়ের কাছে এবং তার বিবেকের/শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করে। গান্ধীজী যাকে হৃদয়ের পরিবর্তন বলেছেন সেই হৃদয়ের পরিবর্তনই সত্যাগ্রহের অভিপ্রায়। সত্যাগ্রহে ধরে নেওয়া হয় অন্যায়কারী আছে, কিন্তু কোনো প্রতিপক্ষ বা বিরোধী নেই। দৈহিক দিক থেকে বাধ্য করলে অন্যায়কারী কোনো প্রকার প্রতিরোধও গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু তাকে তার অন্যায়টি উপলব্ধি করাতে পারলে সে স্বয়ং কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ করবে এবং পরিবর্তনে সচেষ্ট হবে। তাই সত্যাগ্রহ ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। এমনকি বিরোধী ব্যক্তির জন্যও ভালোবাসা থাকতে হয়। যে কোনো প্রকার অবিশ্বাস বা ঘৃণা সত্যাগ্রহের সাফল্যের প্রতিবন্ধক। বিরোধীর মহানুভবতার প্রতি অবশ্য আস্থা থাকতে হবে এবং সে আমাদেরই একজন—এরূপ উপলব্ধি সঞ্জাত ভালোবাসা থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন যে শত্রুর প্রতি অবশ্য শ্রদ্ধাও থাকবে। সত্যাগ্রহ অন্যায়কারীকে অন্যায়টি পরিত্যাগ করার জন্য চেষ্টা করে এবং এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত কার্যকর হয় যখন অন্যায়কারীকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আবেদন করা হয়।

সত্যাগ্রহের জন্য সত্যাগ্রহীর অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন। একজন অন্যায়কারী তার অন্যায়টি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে না, তার ক্রোধ ও ঘৃণা প্রশমনের জন্য সময় লাগে। অন্যায়কারীর শুভবুদ্ধি (good sense) উদ্রেকের জন্য সত্যাগ্রহীকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হবে।

সত্যাগ্রহ হল অহিংসার একটি কৌশল বা কর্মপন্থা। সত্যাগ্রহকে সত্যশক্তি বা আত্মশক্তি বা প্রেমশক্তি নামেও অভিহিত করা হয়। গান্ধীজী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সঙ্গে সত্যাগ্রহের পার্থক্য করেছেন।

প্রথমত, সত্যাগ্রহ কোনো নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়। বস্তুত, এটি হিংসার থেকে সক্রিয়। দ্বিতীয়ত, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে বলপ্রয়োগ থাকে, এটি হিংসা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়। বস্তুত, কোনো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগও রয়েছে। বিপরীতদিকে, সত্যাগ্রহে হিংসা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, এমনকি প্রতিকূল অবস্থাতেও। তৃতীয়ত, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে অন্যকে নিপীড়ন করার কথা স্বীকার করা হয়। কিন্তু সত্যাগ্রহে শত্রুর প্রতি হিংসা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। চতুর্থত, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে আইন অমান্য করা হয়। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সমর্থকেরা আইনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। বিপরীতদিকে, সত্যাগ্রহীরা উচ্চতর বিধি (যেমন—সত্য ও ঈশ্বর)-র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। বস্তুত, সত্যাগ্রহের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি শুরু হয় সত্য ও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। পঞ্চমত, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে ভালোবাসার কোনো সুযোগ নেই। আর সত্যাগ্রহে ঘৃণার কোনো স্থান নেই। বিরোধীকে অপছন্দ করার ভিত্তিতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু ভালোবাসার অনুভূতির উপর সত্যাগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। ষষ্ঠত, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে বিরোধীকে কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো হয় না। কিন্তু একজন সত্যাগ্রহী মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছাতে চায়।

সত্যাগ্রহ অনুসারে প্রেম ও অহিংসার মধ্য দিয়ে দুষ্কর্মের শক্তিকে নিরস্ত্র করতে পারে, কেননা সত্যাগ্রহ হল সত্যের পথ বা দেবমার্গ। গান্ধীজী বিশ্বাস করেন যে ব্যবহারিক দিক থেকে এই কৌশলটি সার্বিক। ছেলেমেয়ে, প্রাপ্তবয়স্ক, নারী, পুরুষ, ব্যক্তি, জাতি বা সমাজ যে কেউ এর অনুশীলন করতে পারে। গার্হস্থ্য জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেও-এর প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি ঈশ্বরের মার্গ বলেই সার্বজনীন।

সত্যাগ্রহীর প্রয়োজন

গান্ধীজী জানতেন যে যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই এই কৌশলটি প্রয়োগ করা সম্ভব, তথাপি এটিকে হালকাভাবে বা সাময়িকরূপে বা অসচেতনভাবে অনুসরণ করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত কঠোর নৈতিক ও ধর্মীয় নিয়মানুবর্তিতা। এই নিয়মানুবর্তিতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে গান্ধীজী সত্যাগ্রহীর থাকা আবশ্যক এরূপ কতকগুলি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হল।

১. একজন সত্যাগ্রহী অবশ্যই সৎ ও সচেতন হবেন। অর্থাৎ তাঁর সৎ উদ্দেশ্য ও সচেতন প্রয়াস থাকবে। এগুলি ছাড়া সত্যাগ্রহ নিছক নামসর্বস্ব হয়ে পড়বে।

২. একজন সত্যাগ্রহীর অবশ্যই কোনো মানসিক সংকীর্ণতা (রক্ষণশীলতা) থাকা চলবে না। তাঁকে অবশ্যই উদার মানসিকতার বা খোলা মনের মানুষ হতে হবে। গান্ধীজী মনে করেন যে কোনো গোপন ধারণা বা উদ্দেশ্য না নিয়ে খোলা মনে আবেদন করলে তবেই বিরোধীদের হৃদয়ে পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হতে পারে।

৩. সত্যাগ্রহীকে অবশ্যই একজন নিয়মনিষ্ঠ সৈনিক হতে হবে। কেবল সত্যই তাঁর প্রভু হওয়া উচিত এবং বিবেক তাঁর পথপ্রদর্শক। তাঁর ভালোবাসা উচিত, কিন্তু দৃঢ়চিত্তে।

৪. এর অর্থ হল সত্যাগ্রহীকে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক হতে হবে। তিনি পার্থিব কোনোকিছু এমনকি মৃত্যুকেও ভয় পাবেন না। গান্ধীজী বলেন যে যিনি ভয়কে জয় করতে পারেননি তিনি কার্যকরভাবে সত্যাগ্রহের পথ অনুসরণ করতে পারবেন না।

৫. নির্ভীকতা থেকে আত্মবলিদান নামক সদ্‌গুণটি আসে। সত্যাগ্রহীকে অবশ্যই মহত্তর সম্ভাব্য আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাঁকে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থপর হতে হবে এবং কোনো আত্মবলিদানই তাঁর পক্ষে মহৎ/যথেষ্ট নয়। সত্যকে রক্ষার তাগিদে এবং অন্যের কল্যাণের জন্য তাঁকে যে কোনো ধরনের যন্ত্রণাভোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৬. যন্ত্রণাভোগ ও আত্মবলিদানের জন্য দৃষ্টিভঙ্গিকে সরল ও নম্র করতে হবে। যদি সত্যাগ্রহী অযথা গর্বিত হয়ে ভাবতে শুরু করেন যে তিনি কোনো মহান কর্মানুষ্ঠান করছেন তাহলে সত্যাগ্রহ বিফলে যাবে। গান্ধীজীর মতে নম্রতা একজন সত্যাগ্রহীর অন্যতম মৌলিক সদ্‌গুণ।

৭. গান্ধীজী মনে করেন যে সত্যাগ্রহীর কেবল তাঁর কর্মেই নয়, মননে ও বচনেও সত্যতা ও অহিংসার অনুশীলন করা প্রয়োজন। তিনি স্বীকার করেন যে এই পুরো অনুশীলনটি তৎক্ষণাৎ সম্ভব নয়, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নিয়মানুবর্তিতা ও সচেতন প্রয়াস অত্যন্ত সহায়ক হবে।

৮. একজন সত্যাগ্রহী অবশ্যই তাঁর আচরণে ও ব্যবহারে দৃঢ় হবেন। তিনি অবশ্যই চাপ সৃষ্টি করবেন না, লোভ দেখাবেন না এবং কোনো অসৎ প্ররোচনা দেবেন না। তাঁর অবশ্যই চারিত্রিক দৃঢ়তা ও দৃঢ় ইচ্ছা থাকবে। সততা ও সংহতি হবে তাঁর আদর্শ।

৯. সত্যাগ্রহীর ভাবনা ও কর্মের মধ্যে সংগতি থাকতে হবে। গান্ধীজী জানতেন যে এরূপ সংগতি না থাকলে নানাবিধ অপরাধ সংগঠিত হয়। অধিকন্তু, ঐ ব্যক্তির অসংহতিপূর্ণ ও অসংগঠিত চরিত্র প্রকাশিত হয়। সত্যাগ্রহীকে দৃঢ়বিশ্বাসী হতে হবে এবং বিরোধীদেরকে ভালোবাসতে হবে। তাই, সত্যাগ্রহীর সম্পাদিত কর্ম, বচন ও চিন্তন—এই তিনের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে।

১০. গান্ধীজী আরো পরামর্শ দেন যে সত্যাগ্রহীকে আত্মসংযমী হতে শিক্ষালাভ করতে হবে। এরূপ অনুশীলনের জন্য তিনি কিছু ব্যবহারিক পরামর্শেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে একটি কার্যকর পরামর্শ হল অনশনের অনুশীলন।

১১. তিনি জীবনের কিছু অপরিহার্য সদ্‌গুণের বিকাশসাধনের পরামর্শও দিয়েছেন। তিনি যে সদ্‌গুণগুলির প্রায়শই উল্লেখ করেছেন সেগুলি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে অস্তেয়, অপরিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।

১২. সত্যাগ্রহীর মধ্যে অবশ্যই সহিষ্ণুতা থাকতে হবে। গান্ধীজী এই শব্দটি ব্যবহারে খুশি নন, কিন্তু অপেক্ষকৃত ভালো কোনো শব্দ না থাকায় এটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন যে একজন সত্যাগ্রহীকে সর্বদাই প্রতিপক্ষ বা শত্রুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হবে। সত্যাগ্রহীর সহিষ্ণুতা না থাকলে আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকবে না এবং পরিণামে ভালোবাসার পথভ্রষ্ট হবেন।

১৩. সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার মতো জীবনের অন্যান্য সদ্‌গুণগুলিও সত্যাগ্রহীর পালন করা উচিত। গান্ধীজীর মতে এগুলি নিয়মানুবর্তিতার বিভিন্ন আকার/রূপ, যেগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তির বিকাশসাধনে সহায়ক হয়।

১৪. সত্যাগ্রহীর ঈশ্বরের প্রতি প্রাণবন্ত বিশ্বাস থাকতে হবে—এটিই সবচেয়ে মৌলিক প্রয়োজন। একজন ঈশ্বর আছেন এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যে দেবত্বের উপাদান বিদ্যমান—এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর সমগ্র সত্যাগ্রহের নীতিটি দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং ঈশ্বরে বিশ্বাস হল একজন সত্যাগ্রহীর জীবনের ধর্মীয় প্রাক্‌শর্ত।

গান্ধীজী মনে করেন যে একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহী, যিনি উল্লেখিত অবশ্যপূরণীয় শর্তগুলি পূরণ করেছেন, তিনি বিস্ময়কর কার্য সমাধা করতে পারেন। তিনি একাই একজন সৈনিকের বা সম্রাটের শাসনের মোকাবিলা করতে পারেন। কেবল একজন সত্যাগ্রহীর সত্যশক্তির কাছেও মহান শক্তিগুলি অবনত হবে।

সত্যাগ্রহের প্রকার

যদিও গান্ধীজী বিশ্বাস করেন যে সত্যাগ্রহ হল একটি সরল কৌশল যা ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রযুক্ত হতে পারে, তথাপি প্রকৃত অনুশীলনের ক্ষেত্রে এর নানা রূপ অনুমোদন করা হয়েছে। সুতরাং নানা প্রকারের সত্যাগ্রহ আছে।

সত্যাগ্রহের কয়েকটি প্রধান প্রধান প্রকারভেদ নীচে দেওয়া হল যেগুলি কেবল গান্ধীজী বা তাঁর অনুগামীরাই ব্যবহার করেননি, অন্য তত্ত্বে বিশ্বাসীরাও (যেমন—কমিউনিস্টরা) ব্যবহার করেছেন।

১. আপস-মীমাংসা ২. সালিস ৩. বিক্ষোভ প্রদর্শন ৪. অর্থনৈতিক বয়কট ৫. অসহযোগ ৬. আইন অমান্য আন্দোলন ৭. প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ৮. অনশন

এই তালিকায় আরও কয়েকটি পন্থা যুক্ত করা হয় যেগুলি কালপ্রবাহে জনপ্রিয় হয়েছে। ৯. ধর্মঘট ১০. পিকেটিং ১১. ধর্না ১২. কর না দেওয়া ইত্যাদি।

এদের সবগুলিকে গান্ধীজী সমানভাবে সমর্থন করেননি। এমনকি কয়েকটিকে তিনি দোষারোপও করেছেন। সত্যাগ্রহ মার্গের সম্ভাব্য ন্যায়ভ্রষ্টতা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি বলেন, "কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভেদহীন প্রতিরোধ গড়ে তুললে তা অবশ্যই আইনহীনতা, লাগামহীন স্বাধীনতা এবং পরিণামে আত্ম-ধ্বংস নিয়ে আসে।" তিনি জানেন যে অভিপ্রায় বিশুদ্ধ না হলে এবং প্রেমের ভাব অবলম্বন না করলে এই সকল পদ্ধতি ব্যর্থ হবে। তাই তিনি সুপারিশ করেন যে সত্যাগ্রহী প্রথমে অবশ্যই অন্যান্য সকল উপায় অবলম্বন করবেন এবং সবশেষে সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেবেন। তিনি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের কাছে বিরামহীনভাবে অনুরোধ করতেই থাকবেন, তিনি অবশ্যই জনমতের কাছেও অনুরোধ করবেন, তাদেরকে বিষয়টি সম্বন্ধে অবহিত করবেন, প্রত্যেকের কাছেই তাঁর বিষয়টি শান্তভাবে ঠান্ডামাথায় তুলে ধরবেন, এবং কেবল এই সকল পন্থা অবলম্বন করার পর তাঁর সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেওয়া উচিত।

জনগণ কখনো কখনো দ্রুত প্রতিদান পাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সত্যাগ্রহ অবলম্বন করে। গান্ধীজী এর সম্পূর্ণ বিরোধী। যেমন, কর প্রদান না করলে তা দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু, তিনি মনে করেন যে আমরা অবশ্যই দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য কর প্রদান না করার রাস্তায় হাঁটব না। তাঁর মতে এই প্রকারের ক্ষিপ্রতা হল একটা মারাত্মক প্রলোভন। কর প্রদান না করা সভ্য বা অহিংস হবে না, বরং এটা হবে অপরাধমূলক ও হিংসাপূর্ণ। একইভাবে, 'ধর্না'-র বর্তমান রূপকে বিদ্রূপ করে তিনি বলেন, "কোন কোন ছাত্র ধর্নায় বসে বর্বরতার প্রাচীন রূপকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। আমি একে বর্বরতা বলি, কেননা এটি দমন করার একটি রূঢ় পন্থা। এটি কাপুরুষোচিতও বটে, কেননা যে ধর্নায় বসে সে জানে যে সে পদদলিত বা অপমানিত হতে যাচ্ছে না। ধর্নায় বসাকে হিংসা বলা মুশকিল, কিন্তু এটি নিশ্চিতভাবেই মন্দ। যদি আমরা আমাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করি, তাহলে আমরা অন্তত তাকে প্রত্যাঘাতে সমর্থ করে তুলি। কিন্তু আমাদেরকে জয়ী করার জন্য যখন আমরা তাকে আহ্বান করি, তখন আমরা জানি যে সে নিজেকে নিশ্চয়ই বিশৃঙ্খল, অবমাননাকর পরিস্থিতিতে ফেলবে না।" এমনকি অসহযোগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই তিনি বলেন যে অসহযোগ অবলম্বন করতে হলে চরম সতর্কতা প্রয়োজন। "অসহযোগের সীমাবদ্ধতাগুলি স্বীকৃত না হলে তা কর্তব্য হওয়ার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয় এবং তা থেকে অপরাধ জন্ম নেয়।" গান্ধীজীর মতে এইসব ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ দুরাগ্রহে (Durāgraha) পরিণত হয়।

বস্তুত, সত্যাগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলি খুবই কঠোর ও অনমনীয়। কোনোরূপ বিচ্যুতি ঘটলেই তা সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে বিকৃত করে দেয়। সতাগ্রহে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনতা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি ভালোবাসা প্রয়োজন। গান্ধীজী অবশ্য স্বীকার করেন যে সত্যাগ্রহের কৌশল প্রয়োগ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তিনি সত্যাগ্রহকে একটি সার্বিক নীতিরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু এর সম্পূর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন। সত্যাগ্রহের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি মৌলিক ও অপরিহার্য শর্ত আরোপ করেন এবং তা হল প্রতিটি মানুষের মধ্যে শুভ প্রকৃতিরূপে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা। এই স্বীকৃতি অবশ্যই কেবল একটি বৌদ্ধিক বোধ নয়, বরং একটি প্রাণবন্ত বিশ্বাস যার উপর আমাদের জীবনাচরণ সন্দেহাতীতভাবে গড়ে ওঠে।

সত্যাগ্রহের যে রূপগুলি গান্ধীজীর কাছে সবচেয়ে প্রিয় তা হল অমান্য, অসহযোগ, সক্রিয় প্রতিরোধ ও অনশন। ন্যায়ভ্রষ্ট আইনগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অমান্য আন্দোলন করা হয়। এব্যাপারে গান্ধীজী সম্ভবত থোরো (Thoreau)-র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং তদনুসারে তিনি মনে করেন যে আইন মান্য করার চেয়েও ন্যায়পরায়ণ ও খাঁটি মানুষ হওয়া নৈতিকভাবে যথার্থ। তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ন্যায়ভ্রষ্টতা, বৈষম্য ও জাতিগত আইনগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন মুখ্যত তখনই এই কৌশল অবলম্বন করেন।

গান্ধীজীর মতে অসহযোগ অনিবার্যভাবে একটি বিশোধন প্রক্রিয়া। এটি প্রতিপক্ষের চেয়ে সত্যাগ্রহীকেই বেশি প্রভাবিত করে। এটি সত্যাগ্রহীকে দুষ্কর্ম মোকাবিলা করার ও দুঃখকষ্ট সহনের শক্তি জোগায়। অসহযোগ বলতে গান্ধীজী বোঝেন এটি নির্যাতিতদের তরফে নির্যাতিত হওয়া প্রত্যাখ্যান করা। গান্ধীজী মনে করেন যে নির্যাতিত হওয়ার জন্য নির্যাতিতরা নিজেরাও দায়ী, কেননা তারা নির্যাতিত হওয়া স্বীকার করে নেয়। নির্যাতিতরা নির্যাতনের শক্তির কাছে পরাভূত হয়। কিন্তু নির্যাতিতরা যখন সেই শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে তখন তাকে অসহযোগ বলে। 'স্বদেশী' হল এই প্রকারের সত্যাগ্রহের একটি দৃষ্টান্ত। সক্রিয় প্রতিরোধ হল প্রকাশ্য গণবিদ্রোহ। যদিও 'বিদ্রোহ' শব্দটি সহিংস পন্থার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, তথাপি 'সক্রিয় প্রতিরোধ' ঐকান্তিকভাবে অহিংস। সক্রিয় প্রতিরোধ এই অর্থে প্রকাশ্য যে এতে কোনো গোপনীয়তা নেই। ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আহ্বান এই প্রকার সত্যাগ্রহের একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু গান্ধীজীর মতে সত্যাগ্রহের সবচেয়ে কার্যকরী রূপটি হল অনশন। অনশন দুটি দিক থেকে কাজ করে—আত্মশুদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কাজ করে এবং স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পথ বেছে নিয়ে এটি প্রতিপক্ষের দুর্দমনীয় মনোভাবকে সংস্কৃত করে। কিন্তু গান্ধীজীর মতে এটি সত্যাগ্রহীর অন্তিম অস্ত্র হওয়া উচিত এবং যখন অন্যান্য পন্থাগুলি ব্যর্থ হয় কেবল তখনই সেই অন্তিম মুহূর্তে অনশন নামক উপায়টি অবলম্বন করা উচিত। অনশন আত্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে এবং প্রতিপক্ষকে কারণ অন্বেষণে বাধ্য করে। তিনি বলেন, "এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যে অনুপাতে তোমরা জৈব প্রকৃতিকে দমন করবে সেই অনুপাতে আত্মশক্তি জাগ্রত হবে।" তিনি আরও বলেন, "আমার ধর্ম আমাকে এই শিক্ষা দেয় যে যখনই কোথাও চরম দারিদ্র্য থাকে যা একজন ব্যক্তি দূর করতে পারে না, তখন তাকে অবশ্যই অনশন করতে হয় ও আবেদন জানাতে হয়।"

মুক্তি ও মুক্তিপথের দর্শন

নৈতিকতার স্বরূপ ও মানদণ্ড সম্বন্ধীয় প্রতিটি নৈতিক ভাবনায় মুক্তি ও মুক্তিপথের সমস্যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। বস্তুত, চিরায়ত নৈতিক ভাবনায় এই দুটি ধারণাকে 'ন্যায়' ও 'কল্যাণ'—এই দুটি ধারণার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'কল্যাণ' শব্দটি 'মুক্তি'কে নির্দেশ করে এবং 'ন্যায়' শব্দটির অর্থ 'আইনানুগ'। আইনানুগ/আইনানুসারী হওয়া মানেই তা কর্ম ও আচরণের পন্থাকে নির্দেশ করে এবং সেকারণেই মুক্তিপথকেও নির্দেশ করে। এজন্যই কখনো কখনো বলা হয় যে 'ন্যায়' ও 'কল্যাণ' পরস্পর ঐকান্তিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত হলে মুক্তি ও মুক্তিপথের মধ্যেও সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কোনো কোনো চিন্তাবিদ্ একথাও বলেন যে মুক্তিপথ ন্যায়সংগত হলে মুক্তিকে কল্যাণকর হতে হবে।

গান্ধীজীও 'মুক্তি' ও 'মুক্তিপথ'কে প্রায় সদৃশ অর্থে বুঝেছেন। কেবল পার্থক্য এইখানে যে তিনি এই ধারণাগুলিকে অধিকতর আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। বস্তুত, এই দুটি ধারণা

তাঁর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। গান্ধীজীর 'সত্য' ও 'অহিংসা'র ধারণায় মুক্তি ও মুক্তিপথের মধ্যেকার সম্বন্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্য হল মুক্তি, আর অহিংসা হল মুক্তিপথ।

মুক্তি ও মুক্তিপথ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত—এটি গান্ধীজীর একটি সাধারণ ধারণা। কিন্তু তিনি এই সাধারণ ধারণাকে অতিক্রম করে যান যখন তিনি বলেন যে 'মুক্তিপথ' ও 'মুক্তি' তাঁর জীবনদর্শনে পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য পদ। এই বক্তব্য আক্ষরিক অর্থে গৃহীত নয়, কেননা এটি কেবল দুটি পদের অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যকে আলোকিত করে। মুক্তি হল 'লক্ষ্য', আর মুক্তিপথ হল সেই লক্ষ্য উপলব্ধির 'উপায়'। উপায় যেমন লক্ষ্য থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না, তেমনি মুক্তিপথও মুক্তি থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না। এই দুইয়ের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেন, "মুক্তিপথ বীজের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে, আর মুক্তি বৃক্ষের সঙ্গে; এবং বীজ ও বৃক্ষের মধ্যে যে সম্বন্ধ রয়েছে সেই একই প্রকারের অলঙ্ঘনীয় সম্বন্ধ রয়েছে মুক্তিপথ ও মুক্তির মধ্যে।" এই বক্তব্য থেকে একথা প্রতিপাদিত হয় যে, যেমন বীজের মধ্যে এরূপ শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে যা বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনি মুক্তিপথের মধ্যে মুক্তির সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত থাকে। এখানে মুক্তি ও মুক্তিপথের একটিকে অন্যটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন এসে যায়। মুক্তি কি মুক্তিপথের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে পারে? আমরা কি যে কোনো উপায়ে কল্যাণকর লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি? কল্যাণকর মুক্তিলাভের জন্য মুক্তিপথকেও কি ঐকান্তিকভাবে কল্যাণকর হওয়া উচিত? কল্যাণকর মুক্তি উপলব্ধির ক্ষেত্রে মুক্তিপথের বিশুদ্ধতাও কি অপরিহার্য? সংক্ষেপে এই সকল প্রশ্নই গান্ধীজীর মনোযোগকে তাঁর মুক্তি ও মুক্তিপথের দর্শনে আকৃষ্ট করে রেখেছে।

ঐকান্তিক আধ্যাত্মিকতা ও সকলকিছুর ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা গান্ধীজী এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আধ্যাত্মিক ঐক্য হল জীবনের আদর্শ, লক্ষ্য বা প্রতিটি কর্মের অন্তিম উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিকতাহীন উপায়ে আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করা যায় না। অর্থাৎ কল্যাণকর মুক্তি কোনো মুক্তিপথের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে পারে না। কল্যাণকর মুক্তি লাভ করতে হলে মুক্তিলাভের জন্য অবলম্বিত মুক্তিপথকেও কল্যাণকর হতে হবে।

একারণেই গান্ধীজী মুক্তিপথের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, "তাঁরা বলেন 'মুক্তিপথ আর যাই হোক মুক্তিপথই।' আমি বলবো 'মুক্তিপথ আর যাই হোক সবকিছু।' মুক্তিপথ যেমন মুক্তিও তেমন। মুক্তি ও মুক্তিপথের মধ্যে কোন ভেদপ্রাচীর নেই। আসলে মুক্তিপথের উপর আমাদের স্রষ্টা প্রদত্ত অত্যন্ত সীমিত নিয়ন্ত্রণ আছে, কিন্তু মুক্তির উপর তা নেই। লক্ষ্যের উপলব্ধি উপায়ের ঠিক সমানুপাতিক। এটি এমনই এক অনুপাত যেখানে কোন ব্যতিক্রম নেই।" তিনি বিষয়টিকে আরও ব্যাখ্যা করেন এটি দেখিয়ে যে কোনো বিশেষ মুক্তিপথের অবলম্বন কর্মের স্বরূপে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এনে দেয়। এমনকি যখন মুক্তি একই কেবল মুক্তিপথ ভিন্ন, তখন মুক্তিপথের স্বরূপানুসারে কর্মের চরিত্রও পৃথক হবে। "যদি আমি তোমার ঘড়িটি কেড়ে নিতে চাই, আমাকে অবশ্যই এর

জন্য লড়াই করতে হবে, যদি আমি তোমার ঘড়িটি কিনে নিতে চাই, আমাকে এর জন্য দাম মেটাতে হবে, এবং আমার অবলম্বিত মুক্তিপথ অনুসারে ঘড়িটি চুরি করা সম্পত্তি, আমার নিজ সম্পত্তি, বা একটি দান। এইভাবে তিনটি স্বতন্ত্র মুক্তিপথ থেকে আমরা তিন প্রকারের স্বতন্ত্র ফল পাই।" এর থেকে বোঝা যায় যে গান্ধীজীর মতে মুক্তি মুক্তিপথকে ন্যায্যতা দান করে না এবং মুক্তিপথের বিশুদ্ধতা কল্যাণকর মুক্তি উপলব্ধির ঐকান্তিক শর্ত। কুপথ কর্মের চরিত্রের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

এর পশ্চাতে যুক্তি রয়েছে। কোনো কর্ম বা কর্মপরিকল্পনার স্বরূপ পরীক্ষা করলে আমরা দেখি যে কর্মের পরিণাম সর্বদাই আমাদের নিয়ন্ত্রণাতীত। মুক্তি হল আদর্শ। তাই তা আমাদের নাগালের মধ্যে বা হাতের মুঠোয় নেই। মুক্তিপথ আমাদের আয়ত্তে ও নিয়ন্ত্রণে আছে। আমরা কেবল মুক্তিপথের পরিবর্তন, বিন্যাস বা কৌশল করতে পারি, কিন্তু কখনোই মুক্তির নয়। কোনো কর্মের কল্যাণ বা অকল্যাণ নির্ভর করে কর্ম সম্পাদনের উপর এবং কোনো কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে আমরা কেবল তার পথটি সম্বন্ধেই অবহিত হই। সুতরাং, মুক্তিপথকে যথার্থ বা ন্যায়সংগত হতে হবে। বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর অবস্থান ব্যাখ্যা করে গান্ধীজী বলেন, "যদিও তুমি লক্ষ্য সম্বন্ধে আমার পরিষ্কার বিবৃতির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছ, কিন্তু যা একবার নির্ধারিত হয়েছে তার পুনরাবৃত্তিতে আমি কখনোই গুরুত্ব দিইনি। লক্ষ্য অর্জনের উপায়গুলি যদি আমরা না জানি ও ব্যবহার করি তাহলে যতই আমরা স্পষ্ট করে লক্ষ্যের সম্ভাব্য লক্ষণ দিই না কেন তা আমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হবে। তাই, আমি নিজেকে মুখ্যত বিভিন্ন পন্থা ও সেগুলির প্রগতিশীল ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। আমি জানি যে আমরা যথার্থ পন্থা অবলম্বন করলে লক্ষ্য অর্জন সুনিশ্চিত। আমিও অনুভব করি যে আমাদের পন্থাগুলি যে অনুপাতে বিশুদ্ধ হবে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রগতিও ঠিক সেই অনুপাতে ঘটবে।"

গান্ধীজীর মুক্তি ও মুক্তিপথের দর্শন প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সত্য ও অহিংসা মতবাদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সত্য হল জীবনের আদর্শ, এই লক্ষ্যাভিমুখেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু এই প্রয়াসের স্বরূপ কী হবে? সত্যে উপনীত হওয়ার পন্থাটি কী হবে? গান্ধীজীর মতে তা হল অহিংসা। তাই গান্ধীজীর মতে সত্য হল মুক্তি, আর অহিংসা হল মুক্তিপথ। আমরা অন্য কোনো পন্থায় সত্য লাভ করতে পারি না। এই সকল বিবেচনা করে গান্ধীজী যখন স্বরাজকে ভারতবাসীর মুক্তি বলে সুপারিশ করেছেন তখন স্বরাজ লাভের জন্য অহিংস পন্থা অবলম্বনের কথা বলেছেন। তিনি স্পষ্টতই বললেন, "সন্দেহ নেই সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বরাজের থেকে অহিংস পন্থায় প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ ভিন্ন প্রকারের হবে।" "হিংস্র পন্থায় সহিংস স্বরাজ পাওয়া যায়। সহিংস স্বরাজ ভারতের নিজের পক্ষে এমনকি সারা বিশ্বের পক্ষে ভয়াবহ বিপদ হবে।" এইভাবে গান্ধীজীর আপসহীন, অকপট সুপারিশ হল মুক্তিরূপে সত্যকে লাভ করতে হলে মুক্তিপথকে বিশুদ্ধ ও অহিংস হতে হবে।

ধর্ম ও নৈতিকতা

কোনো বিশেষ চিন্তাবিদের ভাবনা ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় দার্শনিক আলোচনায় 'ধর্ম' ও 'নৈতিকতা' স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হওয়া উচিত; কেননা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যয়/ধারণা দুটি মূলত স্বতন্ত্র। নৈতিক মূল্য ঐকান্তিকভাবে ইহজগৎ সম্বন্ধীয়, বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ধর্মীয় মূল্য ইহজীবনের অতিবর্তী কোনো বিষয়কে নির্দেশ করে। এই দুপ্রকার মূল্যের সহাবস্থান সম্ভব, কিন্তু প্রত্যয়গতভাবে তারা ভিন্ন। যাইহোক, গান্ধীজীর ভাবনায় তারা একে অপরকে প্রায় ছাপিয়ে যায়। গান্ধীজী মনে করেন যে প্রকৃত ধর্ম ও প্রকৃত নৈতিকতা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। নৈতিকতা বিরোধী যে কোনো ধর্মীয় মতবাদকে তিনি দ্বিধাহীনভাবে নস্যাৎ করেন। তিনি অযৌক্তিক ধর্মীয় ভাবাবেগকে গ্রহণ করতেও প্রস্তুত যদি তা না অনৈতিক হয়। তিনি বলেন, "নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলে আমরা ধর্মীয় হতে পারি না। নৈতিকতাকে অগ্রাহ্য করে এমন কোন ধর্ম নেই। যেমন মানুষ অনৃতভাষী, নিষ্ঠুর ও আত্মসংযমী হয়ে দাবি করতে পারে না যে ঈশ্বর তার পক্ষে আছে।" কিন্তু তখন দার্শনিকবোধের জন্য প্রত্যয় দুটিকে স্বতন্ত্ররূপে গণ্য করতে হবে।

১. ধর্ম

ক. ধর্ম কী ? গান্ধীজীর মতে সত্তা এক, সেই সত্তা ঈশ্বর এবং ঈশ্বর সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই তাঁর ধর্মীয় ধারণাগুলিও নিঃসৃত হয়েছে। যদি সত্য ঈশ্বর হয়, তবে আন্তরিক সত্যান্বেষণ হল ধর্ম। ধর্মকে সাধারণভাবে কোনো উচ্চতর শক্তি বা নীতির কাছে আত্মোৎসর্গরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। গান্ধীজী ধর্মের এরূপ বর্ণনার বিরুদ্ধে নয়। তিনি কেবল বলেন যে ঐ উচ্চতর নীতি হল সত্য এবং সেজন্য সত্য বা ঈশ্বরের প্রতি আত্মোৎসর্গই ধর্ম। নিম্নোক্ত চরণগুলিতে ধর্ম বলতে কী বোঝেন তার একটি রূপরেখা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি বলেন, "ধর্ম বলতে আমি কী বোঝাতে চাই ব্যাখ্যা করতে দিন। এটি হিন্দু ধর্ম নয়.....কিন্তু সেই ধর্ম যা হিন্দুত্বকেও অতিক্রম করে যায়, যা মানুষের স্বরূপকে পরিবর্তন করে, যা মানুষকে সত্যের সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং যা সর্বদাই বিশুদ্ধ করে তোলে। এটি মানব স্বরূপের স্থায়ী উপাদান.....।"

উপরের উদ্ধৃতাংশটি ব্যাখ্যা করলে ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোকিত হবে। প্রথমত, ধর্ম হল মানুষের স্থায়ী স্বরূপের প্রকাশ। জৈবিকতা ও হিংস্রতা মানুষের স্থায়ী স্বরূপ নয়। দেবত্বই মানুষের স্থায়ী স্বরূপ। ধার্মিকতার অনিবার্য উপাদান প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে। দ্বিতীয়ত, ধর্ম মানুষের স্বরূপকে বিশুদ্ধ ও উন্নত করে। গান্ধীজী বিশ্বাস করেন যে প্রকৃত ধর্মীয় ভাবের সামর্থ্য আছে মানুষের স্বরূপকে পরিবর্তন করার, কেননা এটি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কল্যাণকর উপাদানের প্রকাশ। তৃতীয়ত, মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক অস্থিরতাবোধ জাগ্রত করার ক্ষমতা ধর্মের আছে। এই আধ্যাত্মিক অস্থিরতা হল এক প্রকারের তৃষ্ণা, যা কোনো ব্যক্তিকে ন্যায় ও কল্যাণের বোধ

কর্ষণ ও উন্নয়নে সমর্থ করে তোলে এবং তাকে প্রকৃত ন্যায়বান মানুষে পরিণত করে। চতুর্থত, ধর্মীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা অতিবর্তী (the Beyond)-কে জানার কামনা ও জ্ঞানীয় আকুতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। ধর্মীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষায় একপ্রকার অনুভূতি থাকে যে পরম ধর্মীয় আদর্শ ঈশ্বরোপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। পঞ্চমত ও সর্বোপরি, সত্যের প্রতি সচেতন প্রেম ও সত্যলাভের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। এটি ছাড়া ধর্মের অন্য সকল বৈশিষ্ট্য নিষ্ফল হয়ে যায়। তাই গান্ধীজী বলেন যে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার চেয়ে উচ্চতর কোনো ধর্ম নেই।

খ. ধর্মের পথ ঃ গান্ধীজীর মতে ধর্ম নিছক একটি তাত্ত্বিক প্রত্যয় নয় যা বৌদ্ধিক কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। তাঁর মতে ধর্ম হল ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন একটি জীবনপথ। বস্তুত গান্ধীজী অনুভব করেন যে, যে ধর্ম ব্যবহারিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয় এবং সেগুলির সমাধানে সহায়তাও করে না, তা আসলে কোনো ধর্মই নয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রকৃত ধর্ম হবে ব্যবহারিক/ফলিত। তাই, তিনি বলেন যে ধর্মকে জীবনের প্রতিটি দিকে এমনকি রাজনৈতিক জীবনেও পরিব্যাপ্ত হওয়া উচিত। ধর্ম হল একটি বিশ্বাস যে এই বিশ্বের একজন শৃঙ্খলিত নৈতিক নিয়ন্ত্রক রয়েছে। জীবনের সমস্ত দিকে এই বিশ্বাসের ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে।

ধর্মীয় আদর্শ উপলব্ধির পথটি কী হবে? গান্ধীজীর মতানুসারে ধর্মীয় আদর্শ ও আধিবিদ্যক বা নৈতিক আদর্শের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ধর্মের পথটি সত্যেরও পথ—সত্যাগ্রহ। আদর্শ হল 'ঈশ্বরোপলব্ধি'। কোনো ব্যক্তি ন্যায়বান, যদি তিনি সত্য ও অহিংসার পথ অবলম্বন করেন। গান্ধীজী তাই প্রার্থনা, সত্যের ডাকে দৈহিক ও মানসিকভাবে সাড়া দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ, আত্মত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন, প্রেম ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুশীলনগুলির উল্লেখ করেন।

গান্ধীজীর কাছে বিশেষত প্রার্থনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্যবান। বিশেষভাবে সংকটের সময় গান্ধীজী নিঃশব্দ ধ্যান ও প্রার্থনায় মগ্ন থাকেন এবং এরূপ অভিজ্ঞতালাভের পর তিনি নবরূপে উদ্দীপনা, দৈহিক-মানসিক শক্তি ও দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে ফিরে আসেন। গান্ধীজীর মতে প্রার্থনা কোনো জিজ্ঞাসা নয়, এটি হল আত্মার আকাঙ্ক্ষা। প্রার্থনা হল আমাদের জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নের একমাত্র পথ। তিনি বলেন, "প্রার্থনা হল ধর্মের আত্মা বা সারসত্তা স্বরূপ। তাই প্রার্থনা হবে অবশ্যই মানব জীবনের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বিষয়, কেননা ধর্ম ছাড়া কোন মানুষ বাঁচতে পারে না।" কিন্তু গান্ধীজী পূর্বানুমান করেছেন যে এস্থলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। "কিন্তু প্রার্থনার কি আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে? যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন তাহলে তিনি কি জানেন না যে কী ঘটেছে? তাঁকে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম করে তোলার জন্য আমাদের প্রার্থনা করা কি প্রয়োজন?

না, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান। তাঁর সহায়তা ছাড়া কোনো কিছুই ঘটে না। আমাদের প্রার্থনা হল হৃদয়-অনুসন্ধান।

এটি আমাদের নিজেদেরকেই একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের সহায়তা ছাড়া আমরা অসহায়। প্রার্থনা ছাড়া কোনো প্রচেষ্টাই সম্পূর্ণ নয়। সর্বাত্মক মনুষ্য প্রয়াসও নিষ্ফল হয়ে যায়, যদি না তার পশ্চাতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকে—একথা স্বীকার না করলে কোনো প্রচেষ্টাই পরিপূর্ণতা লাভ করে না। প্রার্থনা হল নম্রতাকে আহ্বান। এটি আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের অনুসন্ধান। এইভাবে, প্রার্থনা আমাদেরকে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ করে তোলে এবং ঈশ্বরের আরও সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা শক্তিলাভে সমর্থ হই এবং অন্যের দুঃখ-কষ্টের শরিক হতে প্রস্তুত হতে শিখি।

ধর্মের জন্য প্রয়োজন মানুষের আধ্যাত্মিক দিকগুলির জাগরণ। এই জাগরণের জন্য দেহগত ও ইন্দ্রিয়গত দিকগুলির দমন ও সংযম প্রয়োজন। এর জন্য আমাদের স্বার্থপর উদ্দেশ্যগুলি কঠোরভাবে বর্জন করা প্রয়োজন। স্বার্থের দিক থেকে আমাদেরকে একেবারে শূন্যে পৌঁছাতে হবে। এটি একপ্রকার আত্ম-ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন। কিন্তু এই কৃচ্ছ্রসাধন কোনো পলায়ন নয়। এই জগৎ থেকে পালিয়ে যাওয়ায় গান্ধীজী বিশ্বাসী নন। প্রকৃত কৃচ্ছ্রসাধনের অর্থ অপরের কল্যাণার্থে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত দিকগুলির বর্জন। গান্ধীজী সুপারিশ করেন যে ধর্মপ্রাণ মানুষকে মানুষের মাঝে বেঁচে থেকেই কৃচ্ছ্রসাধন অনুশীলন করতে হবে।

এর অর্থ হল তাকে (ধর্মপ্রাণ মানুষকে) পার্থিব লাভালাভের প্রতি শীতল, উদাসীন ও সংস্রবহীন দৃষ্টিভঙ্গি কর্ষণ ও উন্নত করতে হবে। গান্ধীজী তাঁর মুক্তি ও মুক্তিপথের দর্শন অনুসারে সুপারিশ করেন যে এরূপ কৃচ্ছ্রসাধন অনুশীলন করার পথ হল কৃতকর্মের ফল বা পরিণামের কথা চিন্তা না করে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করা। বস্তুত গান্ধীজী গীতায় বর্ণিত 'নিষ্কাম কর্মে'র পথ অনুসরণ করেছেন। গান্ধীজী গীতাকে তাঁর 'গুরু' বলে অভিহিত করেন এবং গীতায় উপদিষ্ট কর্মমার্গ অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। তাই কৃচ্ছ্রসাধনের অর্থ মানব জাতির কল্যাণার্থে সম্পাদিত নিঃস্বার্থ কর্ম। বস্তুত ধর্মীয় সুপারিশ হল কোনো ব্যক্তির প্রচেষ্টার ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে, কেননা ফলগুলি ঈশ্বরেরই প্রাপ্য—আমাদের নয়।

গ. প্রচলিত ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ঃ গান্ধীজীর মতে ধর্ম প্রায় একটি জীবনপথ। ধর্ম বা জীবনপথ নির্ধারণ করা ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু যদি একজন ব্যক্তির তার নিজের পছন্দ মতো ধর্মীয়পথ গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকে, তাহলে অন্যেরাও যে তাদের নিজেদের পছন্দ মতো ধর্মীয়পথ গ্রহণ করতে পারে—সে বিষয়ে অবশ্যই তার সহনশীলতা ও শ্রদ্ধা থাকতে হবে। তাই, তিনি সুপারিশ করেন যে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি অবশ্যই সহনশীল ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। তাঁর নিজের ধর্মের প্রতি আরো বেশি পরিমাণে সহনশীলতা ও শ্রদ্ধা রয়েছে। যদিও কখনো কখনো এরূপ ধারণা তৈরি হয় যে তিনি হিন্দু ধর্মকে বিশেষভাবে পছন্দ করেন, তথাপি অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তিনি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাই যেভাবে ও যে বাতাবরণে তিনি বড়ো হয়েছিলেন সেখানেই হিন্দুত্বের উপাদান ও মূল বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর

মনে রোপিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, গীতা ও রামায়ণ—এই দুটি গ্রন্থ তাঁর নিত্য সঙ্গী হয়েছিল।

কিন্তু তিনি অসংখ্য ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন—বাইবেল ও কোরান এবং তিনি কিছুসংখ্যক সাধু-সন্ত ও ধর্মগুরুর দ্বারা প্রভাবিত হন। ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন ও ধর্মগুরুদের সান্নিধ্যলাভের ফলে তিনি বিশ্বাস করেন যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সত্য উপলব্ধির পন্থা ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

গান্ধীজী বিশ্বাস করেন যে প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই সু-নীতি ও মহতী শিক্ষা রয়েছে। তিনি আরও লক্ষ করেন যে কিছু ব্যাখ্যা ও ভাষ্য ধর্মের অবনমন ও বিকৃতি ঘটিয়েছে। তিনি এও লক্ষ করেন যে প্রায় প্রতিটি ধর্মই কিছু অযৌক্তিক ও ধর্মোন্মত্ত আচার সৃষ্টি করেছে। তাই, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে সকল ধর্মই যেমন ভালো তেমনি মন্দও। মূলত কল্যাণকর/ভালো—আদর্শের নিরিখে কল্যাণকর, কিন্তু ঘৃণা, ধর্মযুদ্ধ ও ধর্মোন্মত্ততা সৃষ্টির নিরিখে অকল্যাণকর। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিজ্ঞতা এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে। তাই, তিনি প্রস্তাব দেন যে ঐতিহাসিক ধর্মগুলির যুক্তির সীমা অতিক্রম করা অবশ্যই অনুমোদনযোগ্য নয়। এই যুক্তিকে তিনি সংযত যুক্তি (Sober Reason) বলে অভিহিত করেছেন। তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী যে বিচারশক্তির এই উপাদান 'সকল ধর্মের সাহচর্য' বা 'ঈশ্বরের রাজত্ব' নিয়ে আসবে। 'ঈশ্বরের রাজত্ব'—এই খ্রিস্টীয় মতটি তিনি নানা ক্ষেত্রে সমর্থনের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

ঐতিহাসিক ধর্মগুলির প্রতি গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁর নিজের কথায় সংকলিত করা যেতে পারে। ১৯২১-এর একেবারে গোড়ার দিকে এই বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "দীর্ঘ অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে—(১) সকল ধর্মই সত্য, (২) সকল ধর্মের মধ্যেই কিছু ত্রুটি বিদ্যমান, ৩। সকল ধর্মই আমার কাছে আমার নিজের হিন্দুত্বের মতো প্রায় সমান প্রিয়; যেহেতু একজন ব্যক্তির কাছে তার নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো সকল মানুষই আমার প্রিয় হওয়া উচিত। আমার নিজের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার মতো অন্যের বিশ্বাসের প্রতিও সমান শ্রদ্ধা রয়েছে। সুতরাং ধর্মান্তরিত হওয়ার ভাবনা অসম্ভব। বন্ধুত্বের লক্ষ্য হওয়া উচিত একজন হিন্দুকে আরও ভালো হিন্দু হতে, একজন মুসলমানকে আরও ভালো মুসলমান হতে এবং একজন খ্রিস্টানকে আরও ভালো খ্রিস্টান হতে সহায়তা করা। অন্যের জন্য আমাদের প্রার্থনা অবশ্যই এরূপ হবে না "ঈশ্বর, তুমি আমাকে যে আলো দিয়েছ সেই আলো তাকে দাও।" আমাদের প্রার্থনা হবে, "তার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আলো ও সত্য তাকে দাও।" কেবল প্রার্থনা করো যে তোমার বন্ধুরা যেন আরও ভালো মানুষ হতে পারে, তাদের ধর্মের রূপ যাই হোক না কেন।"

এর থেকে বোঝা যায় যে ঐতিহাসিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ না করলেও সকল ধর্মের প্রতিই তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে। গান্ধীজী খ্রিস্ট বা ত্রাতাকে স্মরণ করার বিষয়টির মধ্য দিয়ে ধর্মের সঙ্গে বিচারশক্তিকে কীভাবে সমন্বিত

করেছেন তার সুবিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া যায়। তিনি বলেন, "মাত্র ১৯০০ বৎসর পূর্বে ঈশ্বর ক্রুশ সহ্য করলেন না, কিন্তু আজকাল তিনি তা সহ্য করেন, এবং তিনি মারা যান এবং দিনে দিনে তিনি পুনরুজ্জীবিত হন। ২০০০ বৎসর পূর্বে মৃত কোনো ঐতিহাসিক-ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হলে জগতের স্বাচ্ছন্দ্য অত্যন্ত অল্প হবে। তাই ইতিহাসের ঈশ্বরকে ধর্মোপদেশ দিও না, তাঁকে (ঈশ্বরকে) দেখাও যে তোমার মধ্য দিয়ে তিনি আজকের দিনেও জীবন্ত।"

ঘ. হিন্দুত্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ঃ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করতে গেলে বিশেষত হিন্দুত্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি নিজেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এইভাবে বর্ণনা করেন, "আমার সহধর্মিণীর প্রতি আমার যে অনুভূতি তার চেয়ে হিন্দুত্বের প্রতি আমার অনুভূতিকে অধিকতররূপে বর্ণনা করতে পারি না। তিনি আমাকে আন্দোলিত করেন যা জগতের অন্য কোনো রমণী পারে না। এমন নয় যে তার কোনো ত্রুটি নেই। আমি সাহসের সঙ্গে বলি যে আমার নিজের মধ্যে যে ত্রুটি খুঁজে পাই তার চেয়ে অনেক বেশি ত্রুটি তার রয়েছে। কিন্তু এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের অনুভূতি সেখানে রয়েছে। তাই হিন্দুত্বকেও আমি তার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাসহ অনুভব করি। গীতা ও তুলসীদাসী রামায়ণের সুর যেভাবে আমাকে উল্লসিত করে, আর কোনোকিছুই সেভাবে আমাকে উল্লসিত করে না। হিন্দুত্বের কেবল এই দুটি বই আমি জানি বলে বলতে পারি।" হিন্দুত্বের প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের জন্য গান্ধীজীকে কখনো কখনো হিন্দুত্ব পক্ষাবলম্বী বা হিন্দুত্ববাদী বলে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু গান্ধীজী এটি স্পষ্ট করতে চান যে হিন্দুত্বের প্রতি ভালোবাসা হিন্দুত্বের প্রতি 'পক্ষপাতিত্ব' নয়।

তিনি বলেন যে প্রতিটি ব্যক্তিই একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে, যে পরিমণ্ডলের ঐতিহ্য তার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। জন্মগ্রহণ একটি আকস্মিক ঘটনা হতে পারে, কিন্তু ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার যা জন্মের সহজাত তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলিকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করা অপ্রয়োজনীয় এবং হয়তো নিরর্থকও বটে। ঐতিহ্যের যথার্থ বিকাশ প্রয়োজন। গান্ধীজী অনুভব করেন যে তাঁর প্রারম্ভিক শিক্ষা এবং জন্মগতভাবে যে ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি লালিত পালিত হয়েছেন তাতে হিন্দুত্বই তাঁর পক্ষে সর্বোত্তম। তিনি মনে করেন যে প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে তার পছন্দমতো ধর্ম গ্রহণ করতে পারে, এবং গান্ধীজীর পছন্দ হল হিন্দুত্ব।

কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ হিন্দুমত সম্বন্ধে গান্ধীজীর সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এগুলির মধ্যে কোনো কোনো মতকে তিনি প্রকাশ্যে নিন্দা করেন, কতকগুলিকে পছন্দ ও অনুমোদন করেন, আবার কতকগুলি তাঁর নিজের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিতও করে। যেমন, অস্পৃশ্যতার নিন্দা করে তিনি বলেন যে হিন্দুত্ব অস্পৃশ্যতাকে অনুমোদন করে পাপ করেছে। তিনি আরও বলেন যে অস্পৃশ্যতা নামক হিন্দু আচারটি আমাদেরকে এমনই অধঃপতিত করেছে যে আমরা পরাইয় (Pariah) [দাক্ষিণাত্যের অন্ত্যজ লোক বা জাতি] হয়েছি। আবার, পশু বলির বিরুদ্ধে তিনি বলেন যে বেদে পশু বলির উল্লেখ থাকলেও তা সমর্থন করা যায়

না, কেননা সেগুলি সত্য ও অহিংসার মৌলিক নীতির বিরোধী। এই সকল উল্লেখ সত্ত্বেও এটা নিরাপদে বলা যায় যে তাঁর ধর্মীয় ধারণাগুলি হিন্দুত্বের দ্বারা প্রভাবিত। বস্তুত, সহিষ্ণুতার দৃষ্টিভঙ্গি, যা তিনি অন্যের বিশ্বাসের জন্য সুপারিশ করেছেন, তা হিন্দুত্ব থেকে নিঃসৃত, বিশেষত গীতা থেকে নিঃসৃত, যেখানে ভিন্ন মার্গের মূল্যও স্বীকৃত হয়েছে।

তাঁর ঈশ্বরের ধারণাটি কোনো এক প্রকার ঈশ্বরবাদী বৈষ্ণবধর্ম থেকে নিঃসৃত। গান্ধীজীর লেখাগুলিতে হিন্দু অবতারবাদ, পৌত্তলিকতাবাদ, বংশগতির গুরুত্ব ইত্যাদির সুস্পষ্ট উল্লেখ লক্ষ করা যায়। কিন্তু পার্থক্য এই যে সেগুলি গান্ধীজীর ব্যক্তিগত দৃঢ়বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার আলোকে রঞ্জিত হয়েছে। একটি বিশেষ হিন্দু ধারণা যা অনুমোদনক্রমে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে, তা হল বর্ণাশ্রম ধর্মসহ বর্ণের ধারণা। গান্ধীজী বর্ণাশ্রমকে জন্মের ভিত্তিতে কর্মের স্বাস্থ্যকর বিভাজনরূপে গণ্য করেন। তাঁর মতে সামাজিক শ্রেণি (Caste) সম্বন্ধে বর্তমান যে ধারণা তা আদি ব্যবস্থারই বিকৃতি। গান্ধীজী কোনো বর্ণের উপর অন্য কোনো বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বা কোনো বর্ণের চেয়ে অন্য কোনো বর্ণের নিকৃষ্টতা স্বীকার করেন না। এটি একটি নিখাদ কর্তব্যের প্রশ্ন। এটি কেবল বোঝায় যে একজন ব্যক্তিকে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে, যা তার পূর্বপুরুষেরা সম্পাদন করেছিল। বস্তুত মূল বর্ণ ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছিল এই বিবেচনার ভিত্তিতে যে জন্মগতভাবে মানুষের জীবনের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, বাধ্য-বাধকতা ও কর্তব্য আছে। তার শ্রেণির/প্রজাতির সংরক্ষণ ও ক্রমবিকাশের জন্য তাকে অবশ্যই তার কর্ম সম্পাদন করতে হবে। সম্পদ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে মানুষের জন্ম নয়, কেননা এর কোনো সীমা নেই, এবং পরিণামে আধ্যাত্মিক উপাদানের জাগরণ নামক যে মৌলিক লক্ষ্য মানুষের পূরণ করতে হয়, তা বিস্মৃত হবে। গান্ধীজী এই ব্যবস্থাকে নানা দিক থেকে সুবিধাজনক বলে মনে করেন। এটি অর্থনৈতিক দিক থেকে সুবিধাজনক, কেননা এর মধ্যে শ্রম-বিভাজন রয়েছে। এটি বংশগত দক্ষতাকে সুনিশ্চিত করে এবং অনভিপ্রেত প্রতিযোগিতায় ছেদ টানে। ব্যবসায়ী সংগঠনের সকল সুবিধা এর রয়েছে এবং সর্বোপরি এটি ব্যক্তিগত চরম দারিদ্র্যের সম্ভাবনা হ্রাস করে। এই ব্যবস্থাকে যদি বিকৃত করা না হয় তাহলে এটি সামাজিক বন্ধন উন্নত করে। এমনকি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে এই ব্যবস্থা সুকার্যকরী হয়েছিল, কেননা প্রতিটি সম্প্রদায় তাদের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ বর্ণব্যবস্থার মাধ্যমেই পরিচালনা করেছিল। কিন্তু কোনোভাবে এই ব্যবস্থার সংহতি নষ্ট হল এবং বহু সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব হল। গান্ধীজী মনে করেন যে অগণিত বিভাজন ও আরোপিত কৃত্রিম বিভাজন সমন্বিত বর্তমান সামাজিক শ্রেণি-ব্যবস্থা বর্ণাশ্রমের অত্যন্ত বিরোধী। বস্তুত, গান্ধীজী বর্ণাশ্রমকে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের কর্মপরিকল্পনা (scheme)-র অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াসী হন।

২. নৈতিকতা

ক. ধর্ম ও নৈতিকতা ঃ আগেই বলা হয়েছে যে নৈতিকতা ধর্মের মর্মস্থল (core) বা সারসত্তাকে প্রকাশ করে। গান্ধীজীর মতে প্রকৃত ধর্ম ও প্রকৃত নৈতিকতা পরস্পর

অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মৃত্তিকায় উপ্ত বীজের যেমন জল প্রয়োজন, তেমনি নৈতিকতারও ধর্ম প্রয়োজন। বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ও বৃদ্ধির জন্য যেমন জল প্রয়োজন, তেমনি নৈতিকতাবোধের জাগরণ ও বিকাশের জন্য ধর্ম প্রয়োজন।

এর পক্ষে একটি অত্যন্ত যুক্তিসম্মত কারণ রয়েছে। গান্ধীজীর মতে ধর্মীয় আদর্শ হল সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধি। ঈশ্বর হলেন সকল কিছুর ঐকান্তিক ঐক্য। এই ঐক্য উপলব্ধি করতে হলে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই তার নিজেকে অতিক্রম করে যেতে হবে, স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করে অপরকে ভালোবাসতে হবে। এই আত্ম-অতিক্রান্তির প্রক্রিয়াটি নৈতিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরকে খোঁজার চেষ্টা করলে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এরূপ অন্বেষণ সম্ভব হবে কেবল সকলকে ভালোবাসা এবং সেবা করার মধ্য দিয়ে। এটিই নৈতিকতা। তাই D. M. Datta মন্তব্য করেন, "তাই প্রকৃত আত্মা বা ঈশ্বরোপলব্ধির পথ অন্যকে ভালোবাসা ও অন্যের প্রতি কর্তব্য পালনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এইভাবে নৈতিকতা ধর্মের সারসত্তায় পরিণত হয়।"

খ. নৈতিকতা কী? ঃ নীতিবিদেরা নৈতিকতার ধারণাকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, যে ক্রিয়াগুলিকে কল্যাণকর বা অকল্যাণকর বলে অভিহিত করা যায় কেবল সেই ক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রেই নৈতিকতার প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। স্বতঃসঞ্জাত সহজাত বা প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলি নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই কারণে কেবল ঐচ্ছিক ক্রিয়াকেই নৈতিক বলা যায়। ঐচ্ছিক ক্রিয়াগুলি ঐচ্ছিক অর্থাৎ সেগুলি কর্মকর্তার স্বাধীন বিচারপ্রসূত। সুতরাং সেগুলি ভালো বা মন্দ উভয়ই হতে পারে।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যন্ত্রের মতো ক্রিয়া করি, ততক্ষণ নৈতিকতার প্রশ্ন উঠে না। যদি আমরা একটি ক্রিয়াকে নৈতিক বলে অভিহিত করি, তাহলে তার অর্থ সেটিকে কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে সচেতনভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। যে কোনো প্রকার হিংস্রতা বা ভীতি প্রদর্শনের ফলে সংঘটিত ক্রিয়া নৈতিক পদবাচ্য হয় না। এটাও বলা যায় যে পরলোকে সুখের আশায় অনুষ্ঠিত সকল সুকর্ম নৈতিক নয়।

অন্য অর্থে, নৈতিকতা সম্বন্ধে গান্ধীজীর বর্ণনা খুব বেশি তাত্ত্বিক নয়। তাত্ত্বিক দিক থেকে 'মন্দ' ক্রিয়াগুলিও নৈতিক হতে পারে, কেননা সেগুলি ঐচ্ছিক। কিন্তু গান্ধীজীর মতে, কেবল কল্যাণকর ক্রিয়াগুলিই নৈতিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তাত্ত্বিক নীতিদর্শনে 'নৈতিক' (Moral)-এর বিপরীত হল 'ন-নৈতিক' (Non-moral), কিন্তু গান্ধীজীর দর্শনে 'নৈতিক'-এর বিপরীত হল অনৈতিক (Unmoral/Immoral)। যাকিছু কল্যাণকর ও সদ্‌গুণসম্পন্ন তা-ই নৈতিক। কল্যাণ ও অকল্যাণ হল নৈতিকতার একটি অর্থ, এবং এই অর্থে নৈতিক অনুশাসন অনুসারে জীবনযাপন হল নৈতিকতা। কিন্তু যদি কল্যাণ বলতে অপরের প্রতি কল্যাণ করা বোঝায়, তাহলে অন্যের কল্যাণের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ আত্ম-অতিক্রান্তি বা প্রেম নৈতিকতার সারমর্ম। গান্ধীজীর মতে প্রেম হল দৈব ; এটি নিছক একটি সুবিধা নয়—বরং কর্তব্য। কিন্তু প্রেম কখনো কখনো অন্ধ

হয়। প্রেম মানুষকে কুসংস্কার, এমনকি বর্বরতা ও ধর্মোন্মত্ততার দিকেও চালিত করে। তাই গান্ধীজী বলেন যে অন্ধ প্রেমে নৈতিকতা থাকে না, প্রেম সম্বন্ধে জ্ঞান ও সচেতনতা থাকলে তবেই তাতে নৈতিকতা থাকে। অজ্ঞানতা নিয়ে ভালোবাসলে তা ইন্দ্রিয়গত ও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। জ্ঞানই এরূপ ভালোবাসার প্রতিবন্ধকতা দূর করে। একটি কল্যাণকর ক্রিয়ার উপাদান, শর্ত, উদ্দেশ্য ইত্যাদিরূপে জ্ঞান প্রয়োজন। তাই, জ্ঞান নৈতিকতার একটি অপরিহার্য দিক।

এইভাবে নৈতিকতা হল বিবেকের বাণীকে মান্য করা। এক্ষেত্রে সজ্ঞানে বিবেকের বাণীকে মান্য করা হয় এবং মনে করা হয় যে বিবেকের বাণী আদেশমূলক বা বাধ্যতামূলক। গান্ধীজীর মতে নৈতিকতা সত্যাগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। নৈতিকতার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি প্রকৃত সত্যাগ্রহীর প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

গ. মৌলিক সদ্‌গুণ ঃ প্রকৃত সত্যাগ্রহীর প্রয়োজনীয় গুণাবলীকেই গান্ধীজী সদ্‌গুণরূপে অনুমোদন ও সুপারিশ করেছেন। যে স্বেচ্ছায় সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করেছে, কেবল সে-ই প্রকৃত নৈতিক হতে পারে। সুতরাং সত্যাগ্রহ হল সর্বোচ্চ নৈতিকতা। জীবনের কতকগুলি সদ্‌গুণের উপর গান্ধীজী বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, এই সদ্‌গুণগুলি ধার্মিক ও নৈতিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এই সদ্‌গুণগুলি নূতন কিছু নয়, কিন্তু এগুলির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা অভিনব ও নৈতিকভাবে উপযুক্ত।

প্রতিটি ব্যক্তিরই অনুশীলন করা উচিত এরূপ কিছু মৌলিক সদ্‌গুণের প্রয়োজনীয়তার উপর চিরায়ত ভারতীয় দর্শনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বস্তুত, চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শনতন্ত্রেই স্বীকার করা হয় যে জগৎ একটি নৈতিক বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সেই কারণে জগতের স্বরূপ নৈতিক। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ভালো বা মন্দ প্রতিটি কর্মই কিছু প্রবণতা ও ফল উৎপন্ন করে যা কর্মকর্তাকে ভোগ করতে হয়। এটি হল কর্মবিধিতে বিশ্বাস। নৈতিকতার ভাষায় বিধিটি হল 'যেমন কর্মের তেমন ফল'। তাই কেবল সেই কর্মগুলিই সম্পাদনযোগ্য যেগুলি কল্যাণকর প্রবণতা সৃষ্টি করে। এখানেই মৌলিক সদ্‌গুণগুলি বিকশিত করার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। মৌলিক সদ্‌গুণগুলি কোনো ব্যক্তিকে যথার্থ পথে চলতে সমর্থ করে। ভারতীয় নীতিবিদ্যায় এরূপ পাঁচ প্রকার সদ্‌গুণের কথা বলা হয় ঃ সেগুলি হল অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য। গান্ধীজী এগুলির সবকটিই স্বীকার করেন এবং অতিরিক্ত কয়েকটি যোগ করেন। কেবল পার্থক্য এই যে গান্ধীজী সদ্‌গুণগুলিকে তাঁর স্বকীয় পন্থায়, স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি মনে করেন যে সদ্‌গুণগুলিকে অবশ্যই আধুনিক রীতিতে ব্যাখ্যা করতে হবে, যাতে করে সেগুলি কালের প্রয়োজনের সঙ্গে এবং মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার তৎকালীন শর্তগুলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়।

সদ্‌গুণগুলির বিস্তৃতালোচনার পূর্বে এগুলির অনুশীলন সম্বন্ধে একটি সাধারণ মন্তব্য করতে হবে। গান্ধীজী বলেন যে এই সদ্‌গুণগুলির কেবল বাহ্যত অনুশীলন করলেই হবে

না; চিন্তনে, বচনে ও কর্মেও অনুশীলন প্রয়োজন। নৈতিক ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য বিশুদ্ধতা অর্জন। একজন ব্যক্তি যদি কর্মে, চিন্তনে ও বচনেও সদ্‌গুণসম্পন্ন হয় তাহলেই কেবল সে পূর্ণ বিশুদ্ধতা লাভ করতে পারে।

অহিংসা ঃ গান্ধীজীর মতে অহিংসা হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সদ্‌গুণ। এর স্বরূপ ইতোমধ্যেই স্পষ্ট করা হয়েছে। অহিংসার নৈতিক দিক সহিষ্ণুতা ও ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। এক্ষেত্রে প্রবাদটি হল, সকলেই সমান। তাই ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য একটি আবশ্যিক শর্ত হল প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভালোবাসা। গান্ধীজী অহিংসাকে সর্বোচ্চ সদ্‌গুণরূপে গণ্য করেন (অহিংসা পরমো ধর্মঃ)। এর কারণগুলি এরূপ—(i) কোনো সদ্‌গুণেরই অনুশীলন করা যায় না যদি না সকল মানুষকে বাঁচার অধিকার দেওয়া হয়। আমরা কোনো বন্ধুর প্রতি কর্তব্য করতে পারি না যদি না সে বেঁচে থাকে। (ii) ভালোবাসাকে পূর্বে স্বীকার করে নিলে তবেই অন্য সকল সদ্‌গুণ সম্ভব হয়। সমস্ত সদ্‌গুণের জন্যই কিছু পরিমাণ আত্ম-ত্যাগ প্রয়োজন এবং এই আত্ম-ত্যাগ ভালোবাসা ছাড়া সম্ভব নয়।

সত্য ঃ সত্যকে ঈশ্বররূপে কল্পনা করা হয়। তাই গান্ধীজী বলেন যে সত্য বা সত্যবাদিতাকে মান্য করা একটি সদ্‌গুণ। আমরা কীভাবে সত্যকে জানতে পারি? এবং সত্যকে না জেনে কীভাবে তাকে মান্য করতে পারি? সমস্যাটি সম্পর্কে গান্ধীজী সচেতন। তিনি প্রায় প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মতো স্বীকার করেন যে সত্য হল স্বপ্রকাশ, কিন্তু আমাদের অজ্ঞানতাবশত আমরা তা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। গান্ধীজীর মতে অজ্ঞানতা আত্মার স্বাভাবিক/অপরিহার্য ধর্ম নয়। আমরা আমাদের জ্ঞানের সামর্থ্যকে কোনোভাবে আচ্ছাদিত করে দিই। গান্ধীজী বলেন যে যে কোনো প্রকার নৈতিক অবমূল্যায়ন বা বিকৃতি অজ্ঞানতার কারণ। তিনি স্পষ্টতই ছয়টি চরম শত্রুর উল্লেখ করেন যেগুলি থেকে কুসংস্কার, বিদ্বেষ ও বৈরীভাব জাগ্রত হয় এবং ব্যক্তি সত্য উপলব্ধিতে অক্ষম হয়। এই ছয়টি চরম শত্রু হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য ও মিথ্যাত্ব। সুতরাং সত্য অনুশীলনের জন্য কোনো ব্যক্তিকে এই প্রতিবন্ধকতাগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। তাকে অবশ্যই নৈতিক বিশুদ্ধতা ও সাহস কর্ষণ করতে হবে। তাকে সতর্ক থাকতে হবে যেন তার দৃষ্টিকে এই প্রতিবন্ধকতাগুলি আচ্ছন্ন করতে না পারে।

মনে হতে পারে যে আজকালকার জগতে মিথ্যাত্ব অনেক বেশি সুবিধাজনক। মিথ্যা কথা বলে লোকে সাফল্য পায়। গান্ধীজী কিন্তু এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তিনি অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠভাবে সত্যকে মিথ্যাত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপাদন করেছেন। তিনি বলেন যে এমনকি যখন মিথ্যাত্ব সফল হচ্ছে বলে মনে হয় তখনও তা সত্যের পোশাকে আবৃত থাকে বলেই সম্ভব হয়। কেবল সেই মিথ্যাত্বই সফল হয় যা কিছু সময়ের জন্য সত্যরূপে প্রকাশিত হয়। মিথ্যাত্ব যখন 'সত্য'রূপে উপস্থাপিত হয় কেবল তখনই তা কার্যকরী হয় এবং সাফল্য লাভ করে। এর থেকেই বোঝা যায় যে মিথ্যাত্ব নয়—সত্যবাদিতার মধ্যেই কল্যাণের শক্তি অন্তর্নিহিত আছে।

সত্য কথা বলার ব্যাপারে একটি শর্ত আছে যা গান্ধীজী তার ব্যবহারিক মূল্যের কথা বিবেচনা করে স্বীকার করেন। এই শর্তটিকে স্বীকার করে গান্ধীজী প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় আস্থাশীল হতে চেয়েছেন। শর্তটি হল ঃ সত্য বলা উচিত হৃদয়গ্রাহী করে। নীরস, কর্কশ ও অশোভনীয় রীতিতে সত্যকে প্রকাশ করলে তা সামাজিক দিক থেকে ক্ষতিকারক হতে পারে, কেননা এটি ক্রোধ ও বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে। বস্তুত প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে প্রবাদ আছে, 'সত্য কথা বল, প্রিয় কথা বল; কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথা বলো না।' মনে হয় গান্ধীজী প্রবাদটির প্রায়োগিক উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাই তিনি বলেন যে সত্যবাদিতা অনুশীলন করতে হয়। সত্যবাদিতা একটি শিল্পকলা যাকে নিরন্তর কঠোর অনুশীলন ও তপশ্চর্যার দ্বারা বিকশিত করতে হয়।

অস্তেয় ঃ অস্তেয় শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। অস্তেয় হল দান ব্যতীত অপরের সম্পদ অগ্রহণ। এই বিধি পালনই অস্তেয় শব্দের জনপ্রিয় অর্থ। কিন্তু অস্তেয় শব্দের আরও সংকীর্ণ ও কঠোর একটি অর্থ রয়েছে। এই অর্থে অপ্রয়োজনীয় বস্তু নিজের অধিকারে রাখাও নিষিদ্ধ। গান্ধীজী এই উভয় অর্থেই অস্তেয় শব্দটিকে ব্যবহার করেন। এই সদ্‌গুণটির ক্ষেত্রে গান্ধীজী 'চুরি একপ্রকার হিংসা'—এই জৈনমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বস্তুত সম্পদ হল বাহ্য জীবন, কেননা দৈহিক অস্তিত্ব সম্পদের উপর নিরর্ভশীল। তাই কারও সম্পদ কেড়ে নেওয়ার অর্থ তার বাহ্য জীবন নিয়ে নেওয়া। স্তেয়/চুরি করা ভালোবাসার সর্বোচ্চ সদ্‌গুণের (অহিংসার) সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এই কারণেও অস্তেয় একটি সদ্‌গুণ। তাই গান্ধীজী সুপারিশ করেন যে একজন প্রকৃত ন্যায়বান ব্যক্তিকে অস্তেয় সদ্‌গুণটি কর্ষণের জন্য বিধিসম্মত ব্রত গ্রহণ করতে হবে।

অপরিগ্রহ ঃ অস্তেয় নেতিবাচক, আর অপরিগ্রহ ইতিবাচক তাৎপর্য সমন্বিত। অপরিগ্রহের অর্থ সন্তোষ/তুষ্টি, অতিরিক্ত সম্পদের জন্য অনুশোচনা না করে জীবনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীতেই সন্তুষ্ট হওয়া। একেই অপরিগ্রহ বলে। গান্ধীজী মনে করেন যে সম্পদ আহরণের প্রবণতা সকল দুষ্কর্মের কারণ। তাই ব্যক্তিকে জীবনের শৃঙ্খলা/সংযম কর্ষণ করতে হবে, যা তার অন্তর্নিহিত। এই সদ্‌গুণটি চরমভাবে অনুশীলন করা সম্ভব নয়—একথা গান্ধীজী জানেন। কেননা জীবনে চরম অপরিগ্রহ অসম্ভব। দেহধারণও যেহেতু একপ্রকার পরিগ্রহ, তাই দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণও পরিগ্রহ পদবাচ্য। এই অর্থে আমরা যতদিন বেঁচে থাকি সম্পূর্ণরূপে পরিগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পারি না। তাই ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য মতো অপরিগ্রহ অনুশীলন করতে হবে, কেননা এটি সামাজিক জীবনে বিচ্ছিন্ন হওয়া রোধ করে এবং বিশ্বপ্রেমকে উন্নীত করার শক্ত ভিত জোগায়।

ব্রহ্মচর্য ঃ ব্যুৎপত্তিগতভাবে ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ 'ব্রহ্মে জীবনধারণ'। এর জনপ্রিয় অর্থ হল যৌন সংসর্গ থেকে উপরতি বা অন্তত যৌন ইন্দ্রিয়ের উপর দৈহিক সংযম। বস্তুত, প্রাচীন ভারতীয় জীবন ধারায় একজন শিক্ষার্থীকে প্রথম পঁচিশ বৎসর অধ্যয়ন ও শিক্ষাগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। তাকে ব্রহ্মচারী বলা হত, কেননা সত্তা, ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে

জ্ঞানার্জন করতে হত। এইভাবে একজন ব্রহ্মচারীর যৌন সংসর্গ নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ব্রহ্মচারী শব্দটি এসেছে।

ব্রহ্মচর্য শব্দটিকে গান্ধীজী জনপ্রিয় ও প্রথাগত উভয় অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি যৌন সংযমের গুরুত্বের উপর জোর দেন, কিন্তু ব্রহ্মচর্যকে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। ব্রহ্মচর্য হল সকল ইন্দ্রিয় ও মনের ওপর একটি সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও সংযম। ইন্দ্রিয়গুলি প্রায়শই আমাদেরকে বঞ্চিত ও বিপথগামী করে। অমরত্ব মূলত ইন্দ্রিয়-চাহিদা পরিতৃপ্তির কামনাসঞ্জাত। তাই, আমাদেরকে অবশ্যই একটি তপশ্চর্যা অনুশীলন করতে হবে যার ফলে আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত না হয়ে ইন্দ্রিয়সংযমে সমর্থ হই। বস্তুত ইন্দ্রিয়সংযম না হলে যৌনসংযম হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গান্ধীজী মনে করেন যে আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের রসনা পরিতৃপ্তির জন্য আমরা সুস্বাদু ও মশলাযুক্ত খাবার গ্রহণ করি, যা আবার যৌনাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই গান্ধীজী একটি নূতন খাদ্যাভ্যাস উদ্ভাবন করার জন্য ভিন্ন ধরনের খাদ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। নূতন খাদ্যাভ্যাসে খাদ্যের স্বাস্থ্যমূল্য হ্রাস পায় না। এরূপ খাদ্যাভ্যাস কামার্ত ও অনভিপ্রেত বাসনা সৃষ্টি করে না। এই প্রকার তপশ্চর্যার নাম দেওয়া হয় 'ব্রহ্মচর্য'।

প্রাচীন ভারতীয় নীতিবিদ্যায় এই পাঁচ প্রকার সদ্‌গুণ স্বীকৃত হয়েছে ও সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও গান্ধীজী তাঁর নিজের দিক থেকে কয়েকটি অতিরিক্ত সদ্‌গুণের সুপারিশ করেছেন।

অভয় ঃ আমরা দেখেছি যে ভীতিহীনতা বা অভয় হল অহিংসা অনুশীলনের ঐকান্তিক শর্ত। এটি একটি কঠিন তপশ্চর্যা, কেননা এর জন্য কেবল সাধারণ ভীতিকে জয় করলেই হবে না ; বরং অনাহার, অবমাননা, দৈহিক হিংসা, এমনকি মৃত্যুভয় থেকেও মুক্ত হতে হবে। গান্ধীজী বারংবার ঘোষণা করেন যে কাপুরুষেরা কখনোই নৈতিক হতে পারে না। তাই, অভয় হল প্রতিকূল অবস্থা ও বিপদের মুখোমুখী হয়েও নৈতিক সাহস থাকা নামক একটি সদ্‌গুণ।

ঈশ্বরে বিশ্বাস ঃ গান্ধীজী বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের পরম মহানুভবতায় বিশ্বাস না থাকলে এই সদ্‌গুণগুলির কোনোটিই অনুশীলন করা যায় না। যদি কেউ বিশ্বাস না করে যে বিশ্বের পরম স্বরূপ নৈতিক, তাহলে সে কোনো সদ্‌গুণ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না। এই বিশ্বাস থাকলে তবেই ভালোবাসার অনুশীলন সম্ভব। তাই, ঈশ্বরে বিশ্বাস কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, এটি নৈতিকতার একটি স্বীকার্য সত্য, নৈতিক ও সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবনের একটি শর্ত।

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা

গান্ধীজী নিজেকে 'ব্যবহারিক ভাববাদী' রূপে অভিহিত করতেন। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে গান্ধীজী একজন ভাববাদী। তিনি একটি আধ্যাত্মিক আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু তিনি একজন ব্যবহারিক

দার্শনিক, কেননা তিনি সর্বদাই তাঁর ধারণাগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রয়াস চালিয়েছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি সমাজ, রাষ্ট্র ও সদৃশ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে দেখাতে চেষ্টা করেন যে তাঁর ধর্মীয় ও নৈতিক মতগুলি একজন চিন্তাবিদদের কল্পনাপ্রবণ ধীশক্তির নিছক কাল্পনিক উড়ান নয়। তিনি দেখান যে দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সমাজ ও রাষ্ট্রকে অত্যন্ত সুন্দর রূপদান করা যেতে পারে।

গান্ধীজীর সামাজিক ও রাষ্টনৈতিক মতবাদগুলির রূপরেখা তৈরির পূর্বে একটি বিষয় মনে জাগ্রত হয়। গান্ধীজী একজন তাত্ত্বিকের অভিপ্রায় নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত সমস্যাগুলিতে আলোকপাত করেননি। রাষ্ট্র সম্পর্কিত কোনো তত্ত্ব বা সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি খুঁজে বের করায় তিনি আগ্রহী হন। তাঁর আদর্শ হল একটি ব্যবহারিক বিষয়—সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় কিছু সংস্কারসাধন। তাই, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ 'আদর্শনিষ্ঠ', সেগুলি সর্বদাই 'উচিত'-এর কথা বলে। সেগুলি সবই সত্য ও অহিংসার মৌলিক আদর্শের কথা বলে। এই মৌলিক আদর্শকে ঘিরেই গান্ধীজীর সমগ্র ভাবনা-তন্ত্র (Thought System) গঠিত হয়েছে। যেমন গান্ধীজী শ্রেণি গঠনের প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করবেন না, কিন্তু যে পন্থা/প্রক্রিয়ায় এই ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত হতে পারে তার আলোচনা করবেন।

ক. সমাজ ঃ যে প্রথম প্রশ্নটি দিয়ে সমাজদর্শন শুরু হয় তা হল সমাজের গঠন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন। গান্ধীজী সমাজের উদ্ভব সম্বন্ধীয় সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। শ্রেণি-গঠন সম্বন্ধে যে কোনো বৌদ্ধিক অনুমান স্বীকার করতে গান্ধীজী প্রস্তুত থাকবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গান্ধীজী হবসের মতেরও বিরোধিতা করবেন না। হবসের মতে সমাজ হল একপ্রকার চুক্তির ফল। ব্যক্তি-মানুষ দেখেছিল যে তাদের নিজেদের জন্য সবকিছু তৈরি করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য অন্যের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করা অপরিহার্য।

সমাজের উদ্ভব সম্বন্ধীয় এই প্রকারের আলোচনা থেকে গান্ধীজী একটি নীতি নিঃসৃত করেছেন—যা সমাজের নৈতিক ভিত্তি। মানুষের এই উপলব্ধির মধ্যে সমাজের উদ্ভব নিহিত আছে যে জীবনে চরম স্বার্থপরতার কোনো স্থান নেই। কেবল মানুষ যখন তার নৃশংসতা ও স্বার্থপরতাকে সংযম করার কথা ভাবল তখনই সমাজ অস্তিত্বশীল হল। এইভাবে, মানুষের অহমিকার অতিক্রান্তি ও তার স্বার্থপর উদ্দেশ্যসমূহের ঊর্ধ্বে ওঠার সচেতন প্রয়াসের মধ্যেই সমাজের উদ্ভব নিহিত।

আবার এটাও আপাতভাবে যুক্তিসংগত বলে মনে হয় যে শত্রুতা ও বিবাদ এড়ানোর জন্য প্রারম্ভিক চুক্তি হয়েছিল। অর্থাৎ এটাই জোরালো যুক্তি যে হিংসা এড়ানোর জন্য সমাজ গঠিত হয়েছিল। গান্ধীজী এইভাবে সমাজের ভিত্তি অন্বেষণে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর মতে সমাজ গড়ে উঠেছে অহিংসা ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। এমনকি আজকাল যখন

আমরা কোনো সাধারণ লক্ষ্য পরিপূরণের জন্য ছোটো ছোটো গোষ্ঠীবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ হই, তখনও তার মূলে অহিংসা ও আত্মত্যাগ থাকে। অন্তত কিছু পরিমাণে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করতে হবে। আমাদের যথাসম্ভব আন্তর বিবাদ ও হিংসা এড়িয়ে চলার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই নিঃসৃত হয় যে কোনো সমাজে 'ব্যক্তিগত কল্যাণ' ও 'সামাজিক কল্যাণে'র মধ্যে কোনো বিরোধিতা থাকতে পারে না। সমাজ উদ্ভবের মূলে আত্মত্যাগ থাকলে আমাদের ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সম্প্রীতি থাকে। এটি অত্যন্ত সহজভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষ যখন সম্পূর্ণরূপে হিংস্র ছিল তখন তার জীবনযাত্রা প্রণালী জীবজন্তুদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল না। কিন্তু যখন তারা গোষ্ঠী বা উপজাতি গড়ে তুলল তখন তাদের জীবনযাত্রা স্বতন্ত্র হয়ে গেল। সেই সময় তাদের পেশাও শিকার করা থেকে পশুপালন ও কৃষিকার্যে পরিবর্তিত হয়েছিল। এমনকি সমাজে তাকে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য যত্নবান হতে হয়েছিল এবং অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতে হয়েছিল। গান্ধীজীর মতে এই 'কাজ'-এর জন্যই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। এই 'কাজ'ই প্রতিটি মানুষকে তার সমাজের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে এবং কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজন নয় সমষ্টিগত প্রয়োজন চরিতার্থ করতেও সাহায্য করে।

এইভাবে কাজ সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি হয়ে উঠে। এমনকি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে শ্রম কাজ থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয় এবং তা সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা তত্ত্বগুলিকে 'সংগ্রাম'-এর পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে গান্ধীজী তাঁর তত্ত্বকে কাজ বা শ্রম দিয়ে শুরু করেও ভালোবাসা ও সহযোগিতার পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন।

খ. স্বাভাবিক শ্রেণি বা বর্ণসমূহ ঃ এই আলোচনা থেকে বলা যায় যে একটি স্বাস্থ্যকর সামাজিক জীবন অবশ্যই গড়ে ওঠা উচিত কর্মবিভাজন ও সহযোগিতার সচেতন উপলব্ধির ভিত্তিতে। গান্ধীজী বিশ্বাস করেন যে সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য সমাজের মধ্যে একটি আন্তর বিন্যাস থাকা উচিত যার ফলে প্রতিটি সদস্য তার নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। তিনি বিশ্বাস করেন যে হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ নামক প্রাচীন শ্রেণি বিভাজন এই মূল নীতিতেই করা হয়েছিল। তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিটি মানুষ এই জগতে কিছু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, যেগুলিকে সে অতিক্রম করতে বা জয় করতে পারে না। ঐ সীমাবদ্ধতাগুলির সযত্ন অবলোকন থেকেই বর্ণ নীতিটি অনুমিত হয়েছিল। এটি নির্দিষ্ট প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করল। এটি সমস্ত মূল্যহীন প্রতিযোগিতা এড়িয়ে গেল। সীমাবদ্ধতাগুলি স্বীকার করা সত্ত্বেও বর্ণ নীতিতে কোন উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ স্বীকার করা হয় না। একদিকে প্রত্যেকের তার শ্রমের ফল স্বীকার করা হয়েছে এবং অন্যদিকে তার প্রতিবেশীর উপর চাপ সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই মহান নীতিটি অপ্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস

যে একটি আদর্শ সামাজিক শৃঙ্খলা যখন যথাযথভাবে কার্যকরী হয় এবং তার পরিণামগুলি সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় কেবল তখনই সেই নীতি বিকশিত হয়।" এই অনুচ্ছেদটি থেকে এটি পরিষ্কার যে গান্ধীজী আজকালকার হিন্দু জাতিভেদ প্রথা অনুমোদন করেন না। বস্তুত এটি মূল বর্ণব্যবস্থার একটি বিকৃত রূপ, যেহেতু বর্ণের মূল নীতিকে বিকৃত করা হয়েছে। বর্ণ বলতে একথা বোঝায় না যে জন্মগতভাবে কেউ উচ্চ, কেউ নীচ। বর্ণ কেবল জন্মের ভিত্তিতে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে না। বর্ণ হল শ্রেণি, জাতি নয়। মূল বর্ণভেদ উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের ভিত্তিতে গঠিত নয়—গঠিত হয়েছে একজন ব্যক্তির প্রবণতা, দক্ষতা ও সহজাত ক্ষমতা এবং 'কর্ম বিভাজন' নীতির ভিত্তিতে। মূল বর্ণভেদ নীতি অনুসারে একজন ব্যক্তি জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ বলেই সে ব্রাহ্মণ নয়। কোনো ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হয় এইকারণে যে, সে এমন পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছে যাতে করে সে ব্রাহ্মণের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারবে। একইভাবে কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য, কেউ শূদ্র নামে অভিহিত হয় এইকারণে যে সে তার জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে সমর্থ। একজন শূদ্র যদি সফলভাবে অন্য বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে তবে সে তার বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে। আবার, একটি বর্ণ একটি বিশেষ প্রকারের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে এবং সেই কর্ম বাহ্যত অন্য বর্ণের কর্তব্যকর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়—কেবলমাত্র এই কারণে ঐ বর্ণকে অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। সকল প্রকারের কাজই সমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমভাবে অপরিহার্য। তাই, সকল প্রকারের কাজই সমান।

গান্ধীজী বিষয়টিকে স্পষ্ট করেন এই কথা বলে যে বর্ণ কেবল কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্যের নির্দেশ দেয়, কোনো ব্যক্তি বা বর্ণকে অধিক সুযোগসুবিধার পরামর্শ দেয় না। পৈতৃক ক্রিয়ানুষ্ঠান কোনো ব্যক্তিকে 'জন্মাধিকার' দিতে পারে না, এর কেবল অর্থ হল সমাজে তাকে যে প্রকারের কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে তা ইতোমধ্যেই নির্দিষ্ট/স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে। পৈতৃক/বংশগত উপাদানটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এটি প্রতিদিন নূতন করে কাজের বিভাজন করার ফলে যে শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা দূর করে। বস্তুত, গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে কোনো ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণ পিতামাতার সন্তান হয়েও ব্রাহ্মণের গুণাবলী প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে ব্রাহ্মণ নয়।

এইকারণে গান্ধীজী বর্ণ সম্বন্ধীয় মতবাদকে বর্ণাশ্রম ধর্মের সঙ্গে অপরিবর্তনীয়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। ধর্মের ধারণার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। ধর্মের অর্থ কর্তব্যকর্ম। গান্ধীজী বলেন যে প্রতিটি বর্ণের সুনির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম বা ধর্ম আছে, যা সেই বর্ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। চতুর্বিধ শ্রেণি বিভাজন (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) একজন ব্যক্তির জীবনের চতুর্বিধ পর্যায় বিভাজনের সঙ্গে যুক্ত। ব্যক্তি-জীবনের এই চতুর্বিধ বিভাজন হল চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস)। গান্ধীজী বিশ্বাস করেন যে এই বিভাজনগুলি

যথাযথভাবে বোধগম্য হলে এবং সেগুলির পরিণাম পূর্ণরূপে উপলব্ধি করলে তার ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী নৈতিক সমাজ গঠিত হতে পারে।

গ. খাদ্য-শ্রম ঃ এখন এটা যথেষ্ট স্পষ্ট যে গান্ধীজী প্রতিটি মানুষকে সমানরূপে গণ্য করতে চান। পরিণামে, তিনি সামাজিক বৈষম্য প্রতিরোধ করা ও তাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য কতকগুলি পন্থার কথা চিন্তা করেন। খাদ্য-শ্রম মতবাদটি তাদের অন্যতম। গান্ধীজী এই ধারণাটি বিভিন্ন উৎস থেকে পেয়েছিলেন। যেমন—টলস্টয় ও রাস্কিনের বিভিন্ন লেখা থেকে। আবার বাইবেল ও গীতার উপদেশের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাইবেলে বলা হয়েছে, 'Earn thy bread by the sweat of thy brow'. গীতায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার খাদ্যের জন্য ন্যূনতম শ্রম ব্যয় করে না, সে স্তেয় খাদ্য গ্রহণ করে। গান্ধীজী মনে করেন যে কোনো সমাজে সদস্যদের মধ্যে সাম্যের উপলব্ধি আনয়নের জন্যও এই ধারণাটি উপযোগী হতে পারে।

'খাদ্য-শ্রম' বলতে গান্ধীজী বোঝাতে চান যে বাঁচতে হলে মানুষকে অবশ্যই কাজ করতে হবে। প্রতিটি মানুষেরই শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই ভাবতে হবে যে অন্তত নিজের খাদ্যের জন্য উপার্জন করতে হলে তাকে কিছু হস্তসাধিত কাজ করতে হবে। একথা ঠিক যে প্রতিটি ব্যক্তি সকল প্রকার হস্তসাধিত কাজ করতে পারে না। আবার, যদি প্রতিটি ব্যক্তিকেই সকল প্রকার কাজ করতে হয়, তাহলে বর্ণ তত্ত্বটি ভেঙে পড়ে। গান্ধীজী এ সম্বন্ধে সচেতন। তাই তিনি একথা বলেন না যে প্রতিটি ব্যক্তিরই শস্য ক্ষেত্রে যাওয়া উচিত। যে কোনো ব্যক্তি তার নিজের জন্য এমন কাজ নির্বাচন করতে পারে যা তার পক্ষে করা সম্ভব। সে সুতো কাটতে পারে বা বস্ত্র বয়ন করতে পারে বা কাঠের কাজ করতে পারে বা অন্য যে কোনো কিছু। অন্তত একটা বিষয় সবাই করতে পারে, প্রত্যেকেই তার নিজের ঝাড়ুদার বা মেথর হতে পারে। বস্তুত, হস্তসাধিত কাজের দ্বারা মানুষ তার শরীরকেও মানানসই বা উপযুক্ত করে তুলতে পারে।

কেউ বলতে পারেন যে মানসিক কাজও কাজ বা শ্রম। তাহলে কেন একজন ব্যক্তিকে মানসিক কাজ করার সাথে সাথে হস্তসাধিত শ্রমও করতে হবে বলে বলা হচ্ছে? গান্ধীজী বলেন যে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি হয়। কেননা যারা মানসিক কাজ করে তারা নিজেদেরকে কেবল দৈহিক কাজ করা ব্যক্তিদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। কিন্তু মানসিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও যদি ঝাঁট দেওয়া, পরিষ্কার করা, সুতো কাটা, বাগান তৈরি ইত্যাদি কাজ করে, তাহলে বিভেদ অবলুপ্ত হবে; কেননা সেক্ষেত্রে পরিষ্কার করা বা ঝাঁট দেওয়া নিকৃষ্ট কাজরূপে গণ্য হবে না।

খাদ্য-শ্রমের সঙ্গে একটি শর্ত যুক্ত। বস্তুত এই শর্তটি একটি সার্বিক শর্ত যেহেতু এটি নৈতিকতারই চরম শর্ত। প্রত্যেককে অবশ্যই স্বেচ্ছায় খাদ্য-শ্রম পালন করতে হবে। এখানে বাধ্যবাধকতার কোনো প্রশ্ন নেই। বাধ্যবাধকতা অসন্তোষ ও বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলে। সামাজিক জীবন হবে ভালোবাসা ও স্বেচ্ছা-সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত একটি জীবন।

তাই, খাদ্য-শ্রম মতবাদটিকে মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলে তবেই তা সমাজের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

ঘ. মজুরির সাম্য ঃ সামাজিক বৈষম্য প্রতিরোধে গান্ধীজী আরেকটি সুপারিশ করেন। এটি হল মজুরির গুণগত মান সম্বন্ধীয়। এই মতবাদে সমাজের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর কথা বলা হয়। এতে বলা হয় যে কেবল মজুরির পার্থক্যের ফলে সকল প্রকার বৈষম্য দেখা দেয়। যারা উচ্চতর মজুরি পায় তারা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। যে পেশার লোকেরা অপেক্ষাকৃত ভালো ভাতা পায় তাদের পেশাকে অপেক্ষাকৃত ভালো বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু গান্ধীজী মনে করেন যে সমস্ত কাজই সমান পবিত্র এবং সমাজের পক্ষে সমানভাবে অপরিহার্য। কর্মবিভাজন ও বিতরণের ভিত্তি হওয়া উচিত ব্যক্তির প্রবণতা ও দক্ষতা—মজুরি নয়। তাই, তিনি সুপারিশ করেন যে প্রত্যেক কর্মীর একই মজুরি হওয়া উচিত। একজন মেথর বা ঝাড়ুদারের যে মজুরি প্রাপ্য, একজন উকিল বা ডাক্তার বা শিক্ষকেরও সেই মজুরি প্রাপ্য। এটি যত দ্রুত রূপায়িত হবে মানুষ তত দ্রুত মজুরির ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন করা ত্যাগ করে প্রবণতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন করতে শুরু করবে। এটি সামাজিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবে। গান্ধীজী অবহিত ছিলেন যে 'মজুরির সাম্য'—এই আদর্শটি বাস্তবায়িত করা দুঃসাধ্য। কিন্তু তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী যে এই লক্ষ্যে গৃহীত কোনো পদক্ষেপ সঠিক পদক্ষেপ।

ঙ. শ্রম, মূলধন ও অছিবাদ ঃ মজুরি সংক্রান্ত শ্রম ও সাম্যের মতবাদ থেকে শ্রম ও মূলধনের মধ্যেকার সম্বন্ধের আলোচনা এসে পড়ে। গান্ধীজী মনে করেন যে শ্রম মূলধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোনো ব্যক্তির শ্রম-ক্ষমতা তাকে একপ্রকার মর্যাদা দান করে। এই দিক থেকে তাঁর মতবাদ মার্কসের সদৃশ। কিন্তু যেদিক থেকে তাঁর মতবাদ মার্কসের থেকে বিসদৃশ তা হল, তিনি বলপূর্বক ধনীদের উচ্ছেদ করার কথা বলেননি। মার্কসের মতো তিনি একথা বিশ্বাস করতেন না যে শ্রেণি সংগ্রামই বিকাশের চাবিকাঠি ও মূলনীতি। তিনি বিশ্বাস করেন যে ভালোবাসা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজ গঠিত হওয়া উচিত, সংগ্রামের ভিত্তিতে নয়। অহিংসা মার্গের অনুগামী হয়ে তিনি কোনো প্রকার হিংসা বা সংগ্রামকে অনুমোদন করেননি, এমনকি ধনীদের বিরুদ্ধেও নয়। তাঁর মতে সমাজ অবশ্যই নৈতিকতার ভিত্তিপ্রস্তরে গঠিত হওয়া উচিত। শ্রেণি সংগ্রাম অবিশ্বাস ও ঘৃণা উৎপন্ন করে। শ্রেণি সংগ্রাম একবার শুরু হলে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং সমাজের উপর তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়ে।

এই কারণেই গান্ধীজী ধনীদের অছিপ্রথা সংক্রান্ত মতবাদ প্রবর্তন করেন। গান্ধীজী মনে করেন যে তথাকথিত ধনীরাও মানুষ এবং প্রতিটি মানুষ যে অনিবার্য কল্যাণের অধিকারী, ধনীদের মধ্যেও তা আছে। ভালোবাসার দ্বারা তাদের মন জয় করতে পারলে তাদের মধ্যে নিহিত কল্যাণ জাগ্রত হয় এবং তাদেরকে বোঝানো সম্ভব হয় যে তাদের অধিকারে থাকা সম্পদ দরিদ্রদের কল্যাণে নিয়োগ করা উচিত। ধনীদের এটি উপলব্ধি করা উচিত যে তাদের হাতে থাকা মূলধন আসলে গরিব মানুষের শ্রমের ফসল। এই উপলব্ধি থেকে

তারা বুঝতে পারবে যে মূলধনকে অন্যের কল্যাণে ব্যবহার করার মধ্যেই সমাজের কল্যাণ নিহিত আছে, ব্যক্তিগত সুখলাভের মধ্যে নয়। এরূপ উপলব্ধির ফলে ধনীরা গরিবদের কেবল ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করবে। তখন তারা সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ ট্রাস্টে জমা রাখবে এবং এর ফলে বেশ শক্তপোক্ত/শক্তিশালী অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সাম্য উভয়ই গড়ে উঠবে।

এইভাবে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে অছিপ্রথা বিষয়ে গান্ধীজীর মতবাদ নৈতিকতা ও ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদটি অপরিগ্রহ তত্ত্বের অন্বেষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ধনীরা ভালোবাসার মধ্য দিয়ে অপরিগ্রহের গুণাগুণও অবশ্যই উপলব্ধি করবে। গান্ধীজীর কোনো সমালোচক বলতে পারেন যে এই মতবাদ ধনীদের সততার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এরূপ সমালোচনার কোনো সারবত্তা নেই। কেননা গান্ধীজীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই পূর্বস্বীকৃতির উপর দাঁড়িয়ে আছে যে প্রতিটি মানুষই আন্তরিকভাবে কল্যাণকর। তিনি নানাভাবে এই বিষয়টি প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন, যার থেকে ধনীরাও বাদ যাননি। ধনীরা কেবল আন্তরিকভাবেই কল্যাণকর নয় বাহ্যতও কল্যাণময়, কেননা তাদের মধ্যে কল্যাণ জাগ্রত হয়।

চ. সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ঃ এখন আমরা সমাজের অথনৈতিক ভিত্তির একটি রূপরেখা প্রদান করতে পারি। গান্ধীজী জানতেন যে পূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শটিকে লাভ করা যায় না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষতা ও প্রতিভার বিচারে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকে। তাই, সকল ব্যক্তিকে সমান সুযোগ সুবিধা এবং 'সমান কাজের জন্য সমান মজুরি' প্রদান করলেও ফলাফল ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হবে এবং কেউ বেশি, কেউ কম মজুরি উপার্জন করবে। যদি কঠোরভাবে অর্থনৈতিক সাম্য কার্যকর করা হয় তাহলে তা সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম হয়ে পড়বে, মানুষের কাজের উদ্যোগ নষ্ট করবে এবং তাকে যন্ত্রে পরিণত করবে।

তাই সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অবশ্যই নৈতিক হতে হবে। সমাজ অবশ্যই ভালোবাসা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত হবে। স্বাভাবিকভাবেই এটি অর্থনৈতিক বঞ্চনাকে প্রতিহত করবে। একজন ভালো ব্যক্তি যার অন্তরে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হয়েছে সে তার সম্পদকে অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পছন্দ করবে এবং তার মধ্যেই সে পরিতৃপ্তি খুঁজে পাবে। এইভাবে, অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য গান্ধীজী কঠোর নৈতিকতাবোধ ও অন্যের প্রতি প্রেম কর্ষণ করার সুপারিশ করেছেন।

ছ. অত্যধিক শিল্পায়নের বিরুদ্ধে ঃ গান্ধীজী মনে করেন যে শিল্পায়নের উপর অধিক গুরুত্বারোপের ফলে নৈতিক সমাজের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। গান্ধীজী লক্ষ করেছেন যে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় স্তরে নানা প্রকার অশুভ ও অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিরিক্ত শিল্পায়নের ফলে অনুন্নত দেশগুলির বঞ্চনা, ঔপনিবেশিক বিস্তার, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ ইত্যাদির মতো আন্তর্জাতিক অপরাধ দেখা দেয়। ছোটো দেশগুলি কাঁচামাল সংগ্রহ করা থেকে বঞ্চিত হয় এবং শক্তিশালী দেশগুলি শিল্পক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব

বজায় রাখার জন্য বারংবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অধিক শিল্পায়নের ফলে জাতীয় স্তরেও নানা প্রকার বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং ঐক্য বিঘ্নিত হয়। শিল্পায়নের ফলে ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি হয়। আবার মনুষ্য শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে শিল্পায়ন বেকার সমস্যাও সৃষ্টি করে।

কিন্তু যে মূল কারণে গান্ধীজী অত্যধিক শিল্পায়নের বিরুদ্ধে তা হল এটি মানুষের কর্ম শক্তিকে বিষাক্ত করে তুলে। এটি জীবনকে যান্ত্রিক ও কৃত্রিম করে দেয়, এমনকি মানুষকে যন্ত্রের স্তরে নামিয়ে আনে। ফলে মানুষ জীবনের আনন্দটাই হারিয়ে ফেলে। সে মদ্যপান, জুয়াখেলা বা এইধরনের বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মধ্যে ডুবে যায়। পরিণামে, সে নৈতিকতাবোধ হারায়, আত্মহারাও হয়। এরূপ সম্ভাব্য পরিণামের কথা ভেবে গান্ধীজী ভীত হন। তাই তিনি এরূপ মানব জীবনের সুপারিশ করেন যাতে মানুষের অস্তিত্ব তাৎপর্যপূর্ণ হয় এবং মানুষকে প্রকৃত সুখ ও শান্তি দানে সমর্থ হয়।

জ. সমাজে নারী ও পুরুষ ঃ গান্ধীজীর সামাজিক ধারণাগুলি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায় যে সুখ ও শান্তি চরমভাবে রাজত্ব করবে এরূপ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি মনে করেন যে সমাজে নারী ও পুরুষ তাদের মর্যাদা ও কর্তব্য উপলব্ধি করতে পারলে তবেই এরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা ঘটনা যে নারীরা আজকাল পুরুষদের পথ অনুকরণ করে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। গান্ধীজী এও জানেন যে পুরুষেরা নারীদের উপর প্রভুত্ব করা থেকে নিরস্ত হতে প্রস্তুত নয়। এটা গান্ধীজীর কাছে দুর্ভাগ্যজনক মনে হয়। তিনি মনে করেন যে একটি আদর্শ সমাজে কেবল বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কর্তব্য ও ক্রিয়াকলাপ বণ্টিত হয় না, নারী ও পুরুষের মধ্যেও বণ্টিত হয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে একই আত্মা বিরাজমান, সুতরাং তারা সমান। একজনের জন্য নির্দিষ্ট করা কাজ অন্যজনের জন্য নির্দিষ্ট করা কাজের থেকে নিকৃষ্ট নয়। পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই দৈহিক দিক থেকে শক্তিশালী। সুতরাং পরিবারকে সহায়তা দান ও রক্ষা করার ক্ষেত্রে সে কঠোর শ্রম দান করতে পারে। নারী প্রকৃতিগতভাবে স্নেহশীলা। তাই প্রকৃতিগতভাবেই তারা গৃহের তত্ত্বাবধায়ক হওয়া এবং মায়ের ভূমিকা পালন করার জন্য উপযুক্ত। এই উভয় প্রকার কর্তব্যই যে সমান গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তা নারী ও পুরুষ উভয়কেই বুঝতে হবে।

তাই, গান্ধীজী সুপারিশ করেন যে বিবাহের লক্ষ্য ও জীবনের লক্ষ্য অভিন্ন হবে। বিবাহ অবশ্যই আধ্যাত্মিক জীবন উপলব্ধির একটি পথও হবে। "দেহগত দিকটির মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক মিলন—এই আদর্শকে লক্ষ্য করে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এতে যে মনুষ্য প্রেম মূর্তরূপ ধারণ করে তাকে ঐশ্বরিক ও বিশ্ব প্রেমের প্রথম পদক্ষেপরূপে আশা করা হয়।" এই কারণে তিনি বলেন যে যৌন সংসর্গের লক্ষ্য মানব প্রজাতিকে রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই, বিবাহিত জীবন হবে আধ্যাত্মিক প্রেমময় একটি প্রশিক্ষণ। স্বামী ও স্ত্রীকে সাহচর্যবোধ জাগ্রত করা ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবনযাপন করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

ঝ. **গান্ধীজীর রাষ্ট্রনৈতিক ধারণার স্বরূপ ঃ** গান্ধীজীর রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এক অর্থে অন্যান্য রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কেননা তিনি রাষ্ট্রনীতিকে নীতিবিজ্ঞান ও ধর্মের অধীনস্থরূপে গণ্য করেন। সচরাচর রাষ্ট্রনীতিকে চতুর ব্যক্তির খেলা রূপে গণ্য করা হয়। দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারলে প্রতারণা, অসততা, স্তেয় প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতির অবদানরূপে গণ্য হয়। গান্ধীজী রাষ্ট্রনীতির মধ্যে নৈতিকতা প্রবর্তন করতে প্রয়াসী হন। তিনি আগে থেকে ধরে নেন যে রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হল জগতের পরিচালকরূপে আধ্যাত্মিক আদর্শের একটি দিক। তিনি কঠোরভাবে তাঁর ধর্মীয় ও আধিবিদ্যক বিশ্বাস অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক ধারণাগুলি গড়ে তোলেন। সকল মানুষই ঐকান্তিকভাবে এক এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অপরিহার্য কল্যাণের উপাদান বিদ্যমান। তাই রাষ্ট্রনীতির মধ্যে অবিশ্বাস, ঘৃণা, নীতিহীনতা ইত্যাদি থাকা উচিত নয়। সত্যাগ্রহ গান্ধীজির রাষ্ট্রনৈতিক অস্ত্রও। তিনি রাষ্ট্রনীতির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং তিনি সফলভাবে দৃঢ়বিশ্বাসী হন যে ভালোবাসা ও কষ্টভোগের দ্বারা ঘৃণা ও হিংসাকে জয় করা যায়।

ঞ. **রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ঃ স্বরাজ ঃ** গান্ধীজী স্বীকার করেন যে আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অন্যতম অপরিহার্য প্রাক্‌শর্ত। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি অহিংস সংগ্রামের অবতারণা করেছিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতাকে বোঝাতে তিনি 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। প্রথাগতভাবে শব্দটির অর্থ 'স্বনিয়ন্ত্রণ' বা 'স্বশাসন'। কিন্তু গান্ধীজী শব্দটিকে আরও গূঢ় অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি স্বরাজের প্রচলিত অর্থের সঙ্গে আরও নূতন কিছু অর্থ যোগ করেন। তিনি বলেন, "যেহেতু প্রতিটি দেশ স্বাধীনভাবে খাদ্য, পানীয় ও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, তাই প্রতিটি জাতি তার নিজ নিজ কার্যকলাপ স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারে।" স্বরাজের অর্থকে তিনি আরও প্রসারিত করেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রান্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তিকে অবশ্যই স্বরাজের অর্থ বুঝতে হবে এবং তা বাস্তবায়িত করতে হবে। তাঁর মতে 'নিছক স্বাধীনতা' ও 'স্বরাজে'র মধ্যে এটি একটি পার্থক্য। যদি একটি দেশ স্বশাসন পায় এবং কতিপয় শক্তিশালী দেশের অন্যতম হয়ে নিজেদের হাতে সবকিছু নিয়ে নেয় এবং দরিদ্র জনসাধারণকে অবহেলা করে, তাহলে তা গান্ধীজীর স্বপ্নের স্বরাজ নয়। তিনি এই বিষয়টির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, "আমার স্বপ্নের স্বরাজ হল দরিদ্র মানুষের স্বরাজ। রাজপুত্র বা অর্থবান লোকেরা জীবনের যে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি ভোগ করে তোমাদেরও সেই বস্তুগুলি ভোগ করা উচিত।" "আমার স্বপ্নের স্বরাজ কোন জাতি বা ধর্মীয় ভেদ মানে না.....। স্বরাজ সকলের জন্য....।" "আমি প্রমাণ দিতে পারি যে কতিপয় মানুষের ক্ষমতা অর্জনের দ্বারা স্বরাজ আসবে না। স্বরাজকে যখন বিকৃত করা হয় তখন সেই প্রভুত্বকে প্রতিহত করার জন্য সকলের সামর্থ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে স্বরাজ আসবে। অন্য কথায়, কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য বা দক্ষতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে

সচেতন করে তোলার শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে স্বরাজ অর্জিত হতে পারে।" গান্ধীজীর রচনার এই আত্ম-বিশ্লেষণাত্মক উদ্ধৃতাংশগুলি থেকে স্পষ্ট যে প্রকৃত স্বরাজের অর্থ হল প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতাবোধ থাকতে হবে। বস্তুত, গান্ধীজীর মতে প্রতিটি কাজের চরম লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন। স্বরাজ হল এই বাস্তবায়নের একটি পদক্ষেপ, কেননা এটা কোনো ব্যক্তিকে অন্তত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম করে তুলে।

ট. রাষ্ট্র ও ব্যক্তি ঃ রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধের প্রশ্নটি রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার ধারণা থেকে উত্থাপিত হয়। আজকের দিনে এই সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদগুলি জাতির মৌলিকতায় গুরুত্বারোপ করতে শুরু করেছে এবং বলতে শুরু করেছে যে জাতি থেকে স্বতন্ত্ররূপে ব্যক্তির কোনো মূল্য নেই। গান্ধীজী সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বকে একেবারে অস্বীকার না করেই ব্যক্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। বস্তুত তিনি অনুভব করেন যে এক অর্থে ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি মৌলিক এবং সেটা কেবল এই কারণে নয় যে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের পূর্ববর্তী ; কিন্তু এই কারণেও যে ব্যক্তি হল একক যাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে। (তাঁর মতে ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্রের চেয়ে অধিকতর মৌলিক ; কেননা প্রথমত, ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের পূর্ববর্তী এবং দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি হল একক যাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে।)

গান্ধীজী মনে করেন যে ব্যক্তির বিকাশ স্বীকার না করলে কোনো বিকাশ/অগ্রগতি কখনো সম্ভব নয়। ব্যক্তি থেকেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও শক্তি নিঃসৃত হয়। সুতরাং, ব্যক্তির নিরাপত্তা, শান্তি ও সার্বিক বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা যাতে তৈরি হয় তা দেখা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

গান্ধীজীর মতে জীবনের পরম লক্ষ্য হল নৈতিক। সকল ব্যক্তিরই বিবেক বা নৈতিক চেতনা বিকশিত করতে হবে। সুতরাং, কোনো জাতিই উন্নতির আশা করতে পারে না যদি না তার সকল ব্যক্তি বিশুদ্ধ নৈতিকতাসম্পন্ন হয়। যে কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা সরকার পরিচলিত হয় তাদের খামখেয়ালিপনার কাছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উৎসর্গীকৃত নয়—এই বিষয়টি রাষ্ট্রের দেখা উচিত।

বস্তুত, গান্ধীজী এই নির্দেশ দেন যে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে বঞ্চনা ও বৈষম্য দেখা দিলে অহিংস অসহযোগ উপায়ে রাষ্ট্রের উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি করা একজন ব্যক্তির পরম কর্তব্য। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে এমনকি একজন ব্যক্তিও তার নৈতিক শক্তির সামনে জাতির শক্তিকে অবনত হতে বাধ্য করতে পারে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্বন্ধের এই বর্ণনা থেকে একথা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে কমিউনিস্টদের বিরোধী হিসাবে গান্ধীজী ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। তিনি নৈতিক বিশুদ্ধতায় গুরুত্বারোপ করেছেন।

আত্মবলিদানে নৈতিকতা জাগ্রত হয়। সুতরাং একজন বিশুদ্ধ নৈতিক ব্যক্তি স্বার্থপর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হবেন না। তিনি তাঁর কর্তব্য উপলব্ধি করবেন, তিনি জানবেন যে ব্যক্তিদের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে। গান্ধীজীর মতে ব্যক্তি নৈতিকতাসম্পন্ন হলে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বজায় থাকে। সুতরাং, রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তির অধিকারের কথা বলা উচিত নয়, বরং তার কর্তব্যের কথা বলা উচিত।

বস্তুত গান্ধীজীর মতে, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্বন্ধ হল সহযোগ ও অসহযোগের সম্বন্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র নৈতিকতার পথে অগ্রসর হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে সহযোগের সম্বন্ধ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিকতার পরিপন্থী হলে এটি অসহযোগের সম্বন্ধ।

ঠ. বিকেন্দ্রীকরণ ঃ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ বলতে যদি ব্যক্তির প্রচেষ্টা/উদ্যোগের উন্নীতকরণ বোঝায় তাহলে স্পষ্টতই ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত নয়। গান্ধীজীর মতে ক্ষমতা বা মূলধনের কেন্দ্রীকরণ বঞ্চনা/শোষণের দিকে চালিত করে। অধিকন্তু, বলপ্রয়োগ বা হিংসাকে ব্যবহার না করে কেন্দ্রীকরণকে অক্ষুণ্ণ রাখা বা রক্ষা করা যায় না। কেন্দ্রীকরণের ফলে কতিপয় ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা ও মূলধন কেন্দ্রীভূত হয়। সুতরাং, ঐ ক্ষমতা ও মূলধনের অপব্যবহারের সম্ভাবনা এসে যায়। এই সকল কারণে এবং মুখ্যত তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে তিনি বলেন যে কেবল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগই বিকাশের পথকে সুগম করে তুলতে পারে। গান্ধীজী পরামর্শ দেন যে বিকেন্দ্রীকরণ একটি অপরিহার্য রাষ্ট্রনৈতিক পদক্ষেপ।

কিন্তু সেক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াটিকে তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে দিতে হবে। তাই গান্ধীজী বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রনৈতিক সমাজব্যবস্থার আদর্শ আকার হিসাবে গ্রাম-প্রজাতন্ত্রের কথা বলেছেন। তিনি বলেন যে, যে আদর্শ ব্যবস্থা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বিকাশের জন্য সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা দান করতে পারে তা হল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। প্রধানত কৃষি ও কুটির শিল্পের ভিত্তিতে গঠিত গ্রামগুলিকে নিয়ে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঐচ্ছিক সহযোগিতা থাকবে—একথা এই ব্যবস্থায় আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয়। "অগণিত গ্রাম নিয়ে গঠিত এই ব্যবস্থায় জীবন কোন পিরামিডের মতো হবে না, যার তলদেশ চূড়াটিকে ধরে রাখে। কিন্তু এটি হবে একটি মহাসাগরীয় বৃত্ত, যার কেন্দ্র হবে ব্যক্তি, যে নিজেকে গ্রামের জন্য বলিদান দিতে সদা প্রস্তুত। আবার একটি গ্রাম গ্রামসমূহের বৃত্তের জন্য বিনষ্ট হতেও প্রস্তুত। শেষ পর্যন্ত সমগ্রটি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি জীবনে পরিণত হয়। সর্বাধিক বাইরের পরিধিটির আন্তর বৃত্তকে ভেঙে ফেলার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আন্তর বৃত্ত থেকেই সে তার ক্ষমতা লাভ করে।"

(ড) আদর্শ রাষ্ট্র ও সর্বোদয় ঃ রাষ্ট্রের যে আদর্শ শাসক থাকা উচিত বলে গান্ধীজী মনে করতেন তার রূপরেখা বা প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি যত্নসহকারে নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বস্তুত তিনি অনুভব করেন (মনে করেন) যে একটি

উত্তম, শান্তিপূর্ণ ও সুখী রাষ্ট্র আনয়নের পন্থার উপর আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ করা উচিত। এরূপ রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তি সমান সুযোগ-সুবিধা ও আনন্দলাভ করবে। কিন্তু গান্ধীজী সেই আদর্শ রাষ্ট্রের রূপের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় প্রবেশ করতে চাননি। তিনি অবহিত ছিলেন যে বর্তমানকালে বহু মতবাদ/আদর্শ এবং শাসকের সম্ভাব্য রূপের বহু নাম আলোচনায় এসেছে। কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধীয় বিতর্কের গভীরে প্রবেশ করার প্রয়াস অবিচক্ষণতা ও সময়ের অপ্রয়োজনীয় অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

গান্ধীজীর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা হল গ্রামপ্রজাতন্ত্রের ধারণা। আমরা দেখেছি যে গান্ধীজী স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থার পক্ষে মত পোষণ করেছেন। তিনি মনে করেন যে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি ও ছোটো ছোটো গ্রামগুলির উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দেশ একটি বড়ো 'বস্তু', এটি অত্যন্ত বৃহদায়তনে বর্ধিত। তাই শাসকের কেন্দ্রীভূত রূপের পক্ষে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং ক্ষুদ্র, দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা প্রায় অসম্ভব। সব থেকে ভালো উপায় হল অন্তত প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য বস্তুগুলির জন্য গ্রামগুলিকে স্বশাসিত করে তোলা। প্রতিটি গ্রামই স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া উচিত অন্তত খাদ্য, বস্ত্র, মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের জন্য অপরিহার্য বস্তুগুলির ক্ষেত্রে। বিষয়গুলি যাতে কার্যকর হয় ও স্বচ্ছলভাবে এগিয়ে চলে সেজন্য এই ব্যবস্থায় একটি পঞ্চায়েতও থাকতে পারে। কিন্তু আইন প্রণয়ন করা পঞ্চায়েতের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। কেবল প্রয়োজনেই আইন প্রণীত হওয়া উচিত। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নৈতিকতার ভিত্তিতে গঠিত হওয়া উচিত। গ্রামপ্রজাতন্ত্র অবশ্যই গঠিত হবে কঠোর নৈতিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপলব্ধির ভিত্তিতে। এই ব্যবস্থা হবে নিখুঁত (যথার্থ) গণতন্ত্র; কেননা এটি পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করবে এবং ব্যক্তি উদ্যোগকে উন্নীত করবে। এটি ভালোবাসা, আস্থা, অহিংসা এবং তীব্রভাবে বিকশিত নৈতিকতার ভিত্তিতে গঠিত একটি রাষ্ট্র হবে। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধের মূলকে দূরে সরিয়ে রাখার বাড়তি (অতিরিক্ত) সুবিধা থাকবে। কেননা এরূপ ব্যবস্থায় কোনো পঞ্চায়েত কোনো ব্যক্তির উদ্বৃত্ত সম্পদ বা ক্ষমতা থাকতে দিতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই লোভ বা লালসার কোনো কারণ থাকবে না এবং পরিণামে জীবন হবে অধিকতর শান্তিপূর্ণ এবং কোনো প্রকার শোষণের কোনো সুযোগ থাকবে না।

সর্বোদয়ের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গান্ধীজী রাষ্ট্রনৈতিক সমাজব্যবস্থার এই আকার অনুমোদন করেছেন। ব্যুৎপত্তিগতভাবে সর্বোদয় মানে 'সকলের কল্যাণ'। সচরাচর সর্বোদয়কে উপযোগবাদের সঙ্গে উপমিত করা হয়। উপযোগবাদে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণের কথা বলা হয়। কিন্তু সর্বোদয় উপযোগবাদের চেয়ে অধিকতর ব্যাপক ও পরার্থবাদসম্মত। সর্বোপরি, উপযোগবাদ একটি সুখবাদী মতবাদ। কোনো না কোনোভাবে সুখ বা আনন্দ (pleasure) হল এর মাপকাঠি। অধিকন্তু এই মতবাদ স্বার্থপরতার ভিত্তিতে গঠিত। এই মতবাদ (উপযোগবাদ) অনুসারে একজনের নিজের কল্যাণের জন্যই অন্যের

কথা বিবেচনা করা হয়। বিপরীতদিকে, সর্বোদয় প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ (সর্বোদয়) অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় যে একজন সর্বোদয়ীও অন্যের কল্যাণের জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে প্রস্তুত। সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপেরই লক্ষ্য হল প্রতিটি ব্যক্তিরই উন্নতিসাধন। এটা সম্ভব হবে যদি সমাজস্থ কোনো ব্যক্তিই উপেক্ষিত না হয়। গান্ধীজী মনে করেন কেবল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তির উন্নতিসাধন সম্ভব, কেননা সেক্ষেত্রে সমাজকে ছোটো ছোটো গ্রাম-এককে পরিণত করার ফলে গ্রামের প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি নজর দেওয়া (মনোযোগ দেওয়া) সম্ভব হবে।

আবার উপযোগবাদের পরিধিও সীমিত। আসলে উপযোগবাদ সার্বিক দর্শন হতে পারে না, কেননা 'উপযোগিতা' কথাটির মধ্যে সার্বিকতার কোনো ধারণা নিহিত নেই। উপযোগবাদ আবশ্যিকভাবে কোনো বিশেষ সমাজের কথাই বলে। কোনো একটি সমাজের উপযোগবাদী অন্য সমাজে উপযোগবাদী বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। অন্যদিকে, সর্বোদয় এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিটি বিষয়ের মধ্যেই এক অপরিহার্য ঐক্য রয়েছে। যে বিভেদকামী শক্তি (ব্যাঘাতক শক্তি) 'আমি' ও 'তুমি'র মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তার মূলে থাকে স্বার্থপরতা। কিন্তু নৈতিক নীতিসমূহের কার্যকরী অনুসরণের জন্য একত্বের উপলব্ধি অপরিহার্য ও চরম শর্ত। গ্রামপ্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা এই একত্বের উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা সত্য যে একত্বের পূর্ণ উপলব্ধি এজীবনে সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন আদর্শকে লাভ করার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠে নিরন্তর প্রয়াস ও আদর্শের প্রতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়ে। গ্রামপ্রজাতন্ত্রে মানুষের জীবন হবে এরূপ আধ্যাত্মিক জীবনের একটি দৃষ্টান্ত। কেননা একটি পঞ্চায়েতের প্রতিটি মানুষ অন্য প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং পরিণামে সম্পত্তি দখলের কোনো ধারণা জন্মাবে না। এমনকি, জমি সকলের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। গান্ধীজী বলেন, "প্রকৃত সমাজতন্ত্র আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা আমাদের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়েছে। পূর্বপুরুষেরা শেখালেন, 'সকল জমি গোপালের, তাহলে সীমারেখা কোথায়?' মানুষই ঐ সীমারেখার স্রষ্টা এবং সেই কারণে মানুষই ঐ সীমারেখা মুছে ফেলতে পারে। আক্ষরিক অর্থে গোপাল হল মেষপালক, এটি ঈশ্বরকেও বোঝায়। আধুনিক ভাষায় এর অর্থ রাষ্ট্র, অর্থাৎ জনগণ।" এরূপ রাষ্ট্রের পুলিশ, সেনা ও বিচারালয় হবে আজকের দিনের রাষ্ট্রের থেকে ভিন্ন চরিত্রের। বস্তুত, গান্ধীজী অনুভব করেন যে একটি পূর্ণ অহিংস সমাজে বর্তমান দিনের পুলিশ বা সেনা বা ন্যায়ালয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। সমস্ত সমাজই তৎক্ষণাৎ পূর্ণ অহিংস সমাজে পরিণত হবে—এটা অসম্ভব। সুতরাং, যতদিন পর্যন্ত অপূর্ণতা ও অনৈতিকতা থাকবে ততদিন পর্যন্ত পুলিশ ও ন্যায়ালয় থাকবে। কিন্তু গান্ধীজী বলেন যে তাদের চরিত্র ও কর্মপ্রণালী স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। তারা নিজেদেরকে জনগণের প্রভু বলে মনে করবে না। তাদের উচিত সমাজের প্রকৃত সেবক হওয়া, যাদের প্রাণ অপরাধীদের সংশোধনের জন্য উৎসর্গীকৃত।

বস্তুত গান্ধীজীর ধারণায় একটি রাষ্ট্রে খুব বেশি সমস্যা থাকবে না; কেননা অপরাধের সম্ভাবনা আপনাআপনিই কমে আসবে। যে সামান্য পরিমাণ অপরাধ সংঘটিত হবে তা প্রেমের দ্বারা সামাল দেওয়া যাবে। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী যে এরূপ পুলিশ জনগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পাবে। একইভাবে, অহিংস পন্থার উন্নতিসাধনের জন্য সেনাদের ব্যবহার করা উচিত। সাধারণভাবে অস্ত্র ব্যবহার অনুমোদনযোগ্য নয়, এমনকি সত্যাগ্রহীর অস্ত্র দিয়ে আক্রমণকারীর মোকাবিলা করা যেতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না জনগণ সংস্কৃত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রচলিত অর্থে পুলিশ ও সেনা মোতায়েন থাকবে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "হায়! আজকের দিনে আমার স্বরাজে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন।" "আমিও এব্যাপারে একমত যে হঠাৎ করে সেনা ও পুলিশ তুলে নিলে বিপর্যয় দেখা দেবে, যদি আমরা নিজেদেরকে চোর, ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করার সামর্থ্য অর্জন না করি।"

ঢ. শিক্ষা ঃ যেহেতু গান্ধীজীর রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা এই বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে মহানুভবতার উপাদান প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনিবার্যভাবে বিদ্যমান, তাই মহানুভবতার উপাদানটিকে প্রকাশিত করতে সমর্থ এরূপ একটি উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। গ্রামপ্রজাতন্ত্রের জন্য বা আদর্শ শাসক গঠনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র ব্যক্তিকে প্রস্তুত করে তুলবে। সুতরাং ব্যক্তিদেরকে এমনভাবে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে যে যেন সুবিধাজনকভাবে আদর্শে উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং গান্ধীজীর মতে নৈতিক শিক্ষা বা চরিত্র গঠনের শিক্ষাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রত্যেকের উচিত মহান লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে সকল প্রকার স্বার্থপরতা ভুলে যাওয়া।

তাই গান্ধীজী শিক্ষাকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেন, "শিক্ষা বলতে আমি বোঝাতে চাই শিশু ও মানুষের দেহ, মন ও আত্মায় নিহিত যাকিছু মহত্তম সেগুলিকে সর্বাত্মকভাবে টেনে বের করা (প্রকাশিত করা)।" "আমি মনে করি যে হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি দৈহিক অঙ্গগুলির যথার্থ অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ শিক্ষা সম্ভব হতে পারে। অন্যকথায়, শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সর্বোত্তম ও দ্রুততম পন্থা হল তার দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বুদ্ধিসম্মত ব্যবহার। কিন্তু যদি না আত্মজাগরণের সঙ্গে দেহ-মনের যুগ্ম বিকাশ সাধিত হয় তাহলে কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৌদ্ধিক ব্যবহার ভারসাম্যহীন, একপেশে হয়ে পড়বে। আত্মিক প্রশিক্ষণ বলতে আমি বোঝাতে চাই অন্তরের শিক্ষা। সুতরাং মনের যথার্থ ও সার্বিক বিকাশ সম্ভব হয় যখন শিশুর দৈহিক ও আত্মিক শিক্ষা সমপদক্ষেপে এগিয়ে চলে। শিক্ষায় দেহ, মন ও আত্মার প্রয়োগ একটি অবিভাজ্য সমগ্র গঠন করে। তাই এই মতবাদ অনুসারে দেহ, মন ও আত্মা পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হতে পারে—এরূপ মনে করা হলে তা মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ হবে।"

এইভাবে গান্ধীজী ভারতে প্রচলিত বর্তমান দিনের শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে রায় দেননি। এরূপ শিক্ষা মানুষকে কেবল সাক্ষর করে তোলে, কিন্তু সাক্ষরতা শিক্ষা নয়। প্রতিটি ব্যক্তি কিছু মৌলিক ও সহজাত প্রবণতা বা সামর্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রতিটি ব্যক্তির এই

সহজাত প্রবণতাগুলিকে বিকশিত করাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এটা সম্ভব হবে কেবল যখন তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সমন্বয় ঘটবে। ডিউই (Dewey)-এর মতো গান্ধীজীও কর্মের মধ্যেই শিক্ষার মূল্য অবলোকন করেন। তাই তিনি সুপারিশ করেন যে ছুতোরগিরি, কুক্কুটাদি পালন, সুতো কাটা, বস্ত্র বয়ন বা এই জাতীয় কোনো হস্তশিল্পের মতো কারিগরি শিল্পকৌশল আয়ত্ত করার মাধ্যমে শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত। কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষণ সম্পন্ন হলে ব্যক্তির কর্মে আগ্রহ জন্মায় এবং সে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে। একেই মৌলিক শিক্ষা বলে। এরূপ শিক্ষায় শিশুকে শেখানো হয় যে কীভাবে আত্ম প্রচেষ্টায় বস্তুসমূহকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগানো যায়। শিক্ষার্থী জানতে পারে যে কোনো একটি কর্ম অন্যভাবে সম্পন্ন না করে কেন একটি বিশেষ পন্থায় সম্পন্ন করা হয়।

বর্তমানকালের শিক্ষা ব্যবস্থার থেকে এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুবিধা হল, শিক্ষার্থী দেখবে যে জীবনে শিক্ষালব্ধ বিষয়গুলির প্রকৃত ব্যবহার আছে। এই কারণেই গান্ধীজী আজকের দিনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে একেবারেই অসন্তুষ্ট। একজন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন সমাপনান্তে যে জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করেন সেখানে তিনি দেখেন যে তাঁর অধীত বিষয়ের সঙ্গে সম্পাদনযোগ্য কর্মের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তিনি বলেন, "এখনও পর্যন্ত আমরা শিশু মনকে উদ্দীপিত ও বিকশিত করার কথা চিন্তা না করে বরং তাকে জঞ্জালপূর্ণ করে তোলার দিকেই মনোযোগী হয়েছি। এখন আমাদের এর থেকে বিরত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে হবে এবং মনোযোগ দিতে হবে হস্তচালিত কর্মের মধ্য দিয়ে যথার্থ শিশু শিক্ষার উপর। এই হস্তচালিত কর্ম কোনো আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ নয়, বরং বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণের আদি পন্থা। কোন একটি বৃত্তি বা পৃথক পৃথক বৃত্তির জন্য ছেলেদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই বিশেষ বৃত্তিকে কেন্দ্র করেই তার দেহ, মন, হস্তাক্ষর, শৈল্পিক চেতনা ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সে তার শিক্ষালব্ধ শিল্পকৌশলের প্রভু হয়ে উঠবে।"

এই প্রকারের শিক্ষার আরেকটি সুবিধা আছে। এই প্রকারের শিক্ষা সমাজের আমূল পরিবর্তনের ব্যূহমুখ হবে। এরূপ শিক্ষা নগরজীবন ও গ্রামজীবনকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে (ঘনিষ্ঠ করে তুলবে) এবং অশুভ শ্রেণি বৈষম্যকে সমূলে উৎপাটিত করবে। এটি গ্রাম-সংস্কৃতির অবক্ষয় ও নগরজীবনের লালসাকে প্রতিরোধ করবে এবং এইভাবে প্রতিটি ব্যক্তিকে সমান সুযোগসুবিধা প্রদান করে সামাজিক ন্যায়শৃঙ্খলার ভিত্তি হবে। অধিকন্তু, যেহেতু এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তিদেরকে তাদের নিজ নিজ শিল্পকলায় দক্ষ করে তুলবে, তারা তাদের নিজের নিয়তি নিজেরাই নির্ধারণ করবে এবং তারা বঞ্চনার শিকার হবে না। এই কারণেই গান্ধীজী 'মৌলিক শিক্ষা'কে সুদূরপ্রসারী ফলদায়করূপে বুঝেছেন।

ণ. স্বদেশী, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ ঃ গান্ধীজীর রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল স্বদেশী। স্বদেশী শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'দেশীয় সম্পদ'। গান্ধীজীও প্রায় এই অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। তথাপি গান্ধীজীর

ভাবনায় এটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত এই কারণে যে শব্দটিকে তিনি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন এবং এর উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এই ধারণাটিকে গান্ধীজী সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক—জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

সাধারণভাবে স্বদেশী সম্বন্ধে গান্ধীজীর ব্যাখ্যাকে রাজনৈতিক রং দেওয়া হয় এবং জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু গান্ধীজীর তত্ত্বে স্বদেশীর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক রয়েছে। ইতিবাচক দিক থেকে এর একটি রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি রয়েছে যা জাতীয়তাবাদের রং-এ রঞ্জিত। নেতিবাচক দিক থেকে এটি আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তি।

ব্যাপকার্থে স্বদেশী হল 'বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে দেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার'। কিন্তু এটি স্বদেশীর অতিব্যাপ্ত সংজ্ঞা। সত্যিকথা বলতে কি, যখন দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা ও বিকাশ প্রয়োজন হয় কেবল তখনই বা সেই পরিস্থিতিতেই বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। যদি বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার সুবিধাজনক হয় এবং কুটির শিল্পের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হয়, তাহলে স্বদেশী জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় না।

সুতরাং স্বদেশী কোনো সংকীর্ণ রুচিসম্পন্ন মতবাদ নয়। বরং এটি কর্ম ও সেবা করার ক্ষেত্রে মানুষের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নেয়। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীদেরকে খাদ্য, কর্ম ও কর্মসংস্থান সরবরাহ করতে হবে। স্বদেশী মতবাদ দেশীয় শিল্প রক্ষার্থে নিয়োজিত একটি মতবাদ। স্বদেশী মতবাদ কোনোভাবেই একথা বলে না যে বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহার যে কোনো মূল্যে বর্জন করতে হবে।

এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি ঘৃণার মনোভাব থাকে বা বিদেশী দ্রব্যের প্রতি অপছন্দের মনোভাব থাকে এবং এরূপ মনোভাব অহিংসার মূল ভাবের পরিপন্থী। স্বদেশীও অহিংসার অন্যতম পন্থা। তাই, একজন প্রকৃত স্বদেশী সমর্থক বিদেশী দ্রব্যের প্রতি কোনো কুমনোভাব পোষণ করবে না। দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো বিদেশী দ্রব্য কিনতে গান্ধীজী প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দেশীয় শিল্পের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এরূপ বিদেশী দ্রব্য আমদানির কথা যখন বলা হয়, তখন তিনি স্বদেশী ব্যবহারের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মূলধন ও কর্মদক্ষতা বিদেশের হলেও যদি তা দেশের কার্যকর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে তাহলে সেই দ্রব্য স্বদেশী। যেমন, খাদি বিদেশী মূলধন ও কর্মদক্ষতার দ্বারা উন্নত হলেও তা স্বদেশী। ওষুধ, ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, কারিগরি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি করতে গান্ধীজী কোনোরকম ইতস্তত করবেন না; এমনকি দ্বিতীয়বার আমদানি করার ক্ষেত্রেও। স্বদেশী মানে সকল বিদেশী দ্রব্যের সম্পূর্ণ বর্জন নয়, এটি নিজের দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এইভাবে স্বদেশীর ধারণা থেকে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা বাদের প্রশ্ন উঠে আসে।

গান্ধীজী স্বদেশীর উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করার ফলে বহু মানুষের মনে একটি যথার্থ সংশয় জাগ্রত হয় যে, স্বদেশীর উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করার ফলে তিনি কি

তাঁর নিজের প্রতিই বিরোধিতা করছেন না? একাধারে তিনি ঘোষণা করছেন যে সকলকিছুর মধ্যেই এক অপরিহার্য ঐক্য রয়েছে, আবার একই সঙ্গে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার অর্থাৎ মানবজাতির কেবল একাংশকে ভালোবাসার। গান্ধীজী এ সম্বন্ধে সচেতন এবং তিনি তাঁর স্বকীয় পন্থায় এই সমস্যার সমাধান করেন। তিনি বলেন যে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ঐকান্তিকভাবে একে অপরের বিরোধী নয়।

ভালোবাসার জন্য প্রথম প্রয়োজন আত্ম-অতিক্রান্তি, আত্মকেন্দ্রিকতা বা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করে যাওয়া। এই প্রক্রিয়া পরিবার থেকে সমাজে, সমাজ থেকে জাতিতে, জাতি থেকে সমগ্র মানবজাতিতে—এইভাবে পরিব্যাপ্ত হতেই থাকে। বস্তুত গান্ধীজী মনে করেন যে ভালোবাসাকে কার্যকর করতে গেলে তাকে বিশেষায়িত করতে হবে। প্রেমকে অন্তত শুরুতে যদি বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ করা না হয় তাহলে সকলকিছুর জন্য সাধারণ প্রেমের কোনো তাৎপর্য থাকে না। (অর্থাৎ গান্ধীজীর মতে সাধারণ প্রেম বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত প্রেমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।) ঠিক বন্ধুত্ব যেমন দুজন বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া গড়ে ওঠে না, তেমনি প্রেমও ব্যক্তিবিশেষ ছাড়া সম্ভব নয়। প্রেম কোনোকিছু থেকে সকলকিছুর দিকে যাত্রা করে; বিশেষ থেকে সামান্যের দিকে যাত্রা করে। তাই জাতির প্রতি প্রেম বা স্বদেশীর কথা বলা স্ববিরোধিতা নয়। জাতীয়তাবাদ একপ্রকার গুণ।

স্বদেশী বা জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী নয়, আবার সমগ্র মানব জাতির প্রতি সাধারণ প্রেমের পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। গান্ধীজী বিশ্বাস করেন যে একজন মানুষ একইসঙ্গে তার প্রতিবেশী এবং সমগ্র মানব জাতির সেবা করতে পারে। প্রতিবেশীর সেবা করতে গেলে স্বার্থপরতার বা কোনো মানুষকে বঞ্চনা করার আবশ্যকতা নেই। নিজের দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবাদের কথা বলতে গিয়ে গান্ধীজী বলেন, "আমার দেশাত্মবোধ বর্জনমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উভয়ই। এটি বর্জনমূলক এই অর্থে যে আমার জন্মভূমির প্রতিই মনোযোগ নিবদ্ধ করি, কিন্তু এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এই অর্থে যে আমার সেবা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বা শত্রু মনোভাবাপন্ন নয়।" বস্তুত, যদি আমার কোনো দেশের বিরুদ্ধে শত্রুতা না থাকে এবং কোনো দেশের বিরুদ্ধে কোনো কাজ না করি, তাহলে আমার জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী নয়। জাতীয়তাবাদ স্বয়ং কোনো পাপ নয়, আবার আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধীও নয়। সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার দ্বারা এটি পাপে পরিণত হয়।

গান্ধীজীর মতে, জাতীয়তাবাদ বাস্তবে আন্তর্জাতিকতাবাদের একটি প্রাক্-শর্ত। জাতীয়তাবাদ বাস্তবায়িত হলে অর্থাৎ জনগণ নিজেদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্র হিসাবে সংগঠিত করে একটি একক সত্তারূপে ভূমিকা পালন করলে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রশ্ন উঠে আসে। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অবশ্যই স্বাস্থ্যকর আন্তর-নির্ভরশীলতা থাকবে। এরূপ আন্তর-নির্ভরশীলতা সম্ভব হবে কেবল যখন প্রেমের উপলব্ধি বা আন্তর্জাতিকতাবোধ

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিকশিত হবে। গান্ধীজী বলেন যে সকল রাষ্ট্রকে সমান বলে স্বীকৃতি দিলে এবং রাষ্ট্রগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্ভব হয়। যখনই আমরা বড়ো ও ছোটো রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে শুরু করি, তখনই আন্তর্জাতিকতাবাদ বিঘ্নিত হয়। আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্য অপর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হল প্রতিটি রাষ্ট্রকে অবশ্যই অহিংসার মূল্য ও গুরুত্ব প্রশংসা ও উপলব্ধি করতে হবে। গান্ধীজী সুপারিশ করেন যে প্রতিটি রাষ্ট্রের উচিত স্বেচ্ছায় নিরস্ত্রীকরণ করা।

এইভাবে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে গান্ধীজী প্রেমের বিধিটিকে মানুষ ও রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছেন। ঠিক যেমন মানুষকে অন্যের কাছে প্রেমী, দয়ালু ও বন্ধু হওয়ার কথা বলা হয়, তেমনি রাষ্ট্রগুলিকেও অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে প্রেমী ও বন্ধু হতে বলা হয়। আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতীয়তাবাদেরই বিস্তৃত রূপ, যা মানুষের আত্মত্যাগ ও ভালোবাসার বিস্তৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। "ব্যক্তি স্বাধীন হয়ে পরিবারের জন্য আত্মত্যাগ করে, পরিবার গ্রামের জন্য, গ্রাম জেলার জন্য, জেলা রাজ্যের জন্য, রাজ্য রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্র সকলের জন্য।"